গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তিঃ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এর প্রভাব।

মোঃ নজরুল ইসলাম

Dhaka University Library
384672

384672

তারিখ ঃ- ২১/৯/২০০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

তত্ত্বাবধায়ক
........শওকত আরা হোসেন........
ডঃ শওকত আরা হোসেন
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

M.Phil.

GIFT

384672

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তিঃ
বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এর প্রভাব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এম. ফিল
ডিগ্রী অর্জনের জন্য উপস্থাপিত।

গবেষক
মোঃ নজরুল ইসলাম
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

384672

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ শওকত আরা হোসেন
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বৃটিশ উপনিবেশবাদের নীল নকশায় ১৮৫৩ সাল থেকে দেড়শত বছর জরিপ কার্য চালিয়ে কোলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষার অজুহাতে ভারত গঙ্গা নদীর ফারাক্কা পয়েন্টে বাঁধ নির্মান করে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত নবীন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করেছে। মুক্তিযুদ্ধে ভারত বাংলাদেশকে নজীরবিহীন সহাযোগিতা দান করলেও পানি বন্টনের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল অনীহা প্রকাশ করেছে। আমার অভিসন্দর্ভে এ অনীহার ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষন করা হয়েছে। তবে গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রেক্ষাপট হলো, "গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এর প্রভাব," গোটা বিশ্লেষন কয়েকটি মৌল প্রশ্নের ভিত্তিতে এগিয়েছে; এবং সে গুলো হলোঃ (ক) ভারত কেন ফারাক্কা বাঁধ নির্মান করেছে? (খ) কখন ও কিভাবে নির্মান করেছে? (গ) এই বাঁধ নির্মানের পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কিনা? (ঘ) গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে কতটুকু প্রভাবিত করেছে?
(ঙ) বাংলাদেশের অর্থনীতি ও পরিবেশ কতখানি ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে?

384672

আমার এই গবেষণা কর্মে, গবেষণা প্রস্তাব তৈরী থেকে শুরু করে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি নির্ধারণ, তথ্য বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব কাঠামো উন্নয়নসহ প্রতিটি পর্যায়ে পরামর্শ দিয়েছেন, দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন এবং অপরিসীম উৎসাহ দিয়েছেন আমার গবেষণা তত্ত্বধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শওকত আরা হোসেন। এ ছাড়া আমার বিভাগীয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মন্ডলী যখন যাঁর কাছে গিয়েছি তাঁরা আমাকে বিভিন্ন পরামর্শ ও তথ্য প্রদান করেছেন। সে জন্যে তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার জন্যে পেশাগত দায়িত্ব থেকে সাময়িক ছুটি দেয়ার জন্য নাজিরপুর শ. জি. কলেজ এবং কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ আফতাব উদ্দীন আহমদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তালিকায় আছে কিছু প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে সংগ্রহ করেছি গবেষণার মূল উপাত্ত সমূহ। এ গুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী ও বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ গ্রন্থাগার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সেপ্টেম্বর ২০০০

মোঃ নজরুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্রঃ

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	i-ii
অধ্যায়-১	ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি	১-৮
	১.১. ভূমিকা	
	১.২. যৌক্তিকতা	
	১.৩. উদ্দেশ্য	
	১.৪. সময় নির্ধারণ	
	১.৫. বই আলোচনা	
	১.৬. পদ্ধতি	
	১.৭. উত্থাপিত প্রশ্ন ও উত্তর	
	১.৮. সীমাবদ্ধতা	
	১.৯. উপাত্ত সংগ্রহ	
	১.১০. অভিসন্দর্ভ বিন্যাস	
	১.১১. উপসংহার	
অধ্যায়-২	ফারাক্কা বাঁধ নির্মানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ভৌগলিক অবস্থান।	৯
অধ্যায়-৩	প্রথম পানি বন্টন চুক্তি ও মূল্যায়ন	২৬
অধ্যায়-৪	সমঝোতা স্মারক ও মূল্যায়ন	৪৩
অধ্যায়-৫	১৯৯১-৯৫ সাল পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহএবং ১৯৯৬ সালের দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর ও মুল্যায়ন।	৬৩
অধ্যায়-৬	বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অর্থনীতি ও পরিবেশেরর উপর ফারাক্কা বাঁধ ও পানি বন্টন চুক্তির প্রভাব।	৮২
অধ্যায়-৭	উপসংহার	১১১
	গ্রন্থপঞ্জী	১১৬
	শব্দ সূচী	১১৯

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১

ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

১.১ ভূমিকাঃ- বায়ু, পানি ও সুর্যকিরণ, সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার প্রধানতম পুর্বশর্ত। যেপুর্ব শর্তগুলোর বিকল্প আজো পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয়নি। এবং এর একটির অনুপস্থিত সকল প্রাণীর প্রাণ নাশের কিংবা একটি সভ্যতার বিনাশ অথবা একটি জনপদ প্রাণহীন, মরুভূমি ও চির অন্ধকারে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হতে পারে। এ তিনটি মৌল উপাদান নিয়ে আর যাই হোক, কাউকে বঞ্চিত করা কিংবা রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করা সম্পুর্ণ রূপে মানবতা বিরোধী। কেননা প্রকৃতি এগুলো তার অকৃত্রিম সুন্দর হস্তে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তার সৃষ্টি কল্যাণে দান করেছে।

বায়ু ও সুর্যকিরণকে নিয়ন্ত্রণ করার অথবা এদু'টো থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা যুথচারী মানবের নেই। কিন্তু পানি প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মানুষের রয়েছে, রয়েছে কোন জনগোষ্ঠীকে পানি থেকে বঞ্চিত করে হীনস্বার্থ চরিতার্থে রাজনীতির ঘোলা জলে মানুষ শিকার করার প্রবনতা। এ রকম এক নিষ্ঠুর প্রবনতার শিকারে পরিনত হয়ে বাংলদেশ নামক রাষ্ট্রটি যখন ক্রমাগত মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার উপক্রম ঠিক এমনি এক প্রেক্ষাপটে বারবার হৃদয় নিংড়ানো অভিপ্রায় জানিয়ে বাংগালী জাতি স্বাধীনতার পর ১৯৭৭ সালে প্রথম পাঁচ বছর মেয়াদী একটি চুক্তি, ১৯৮২ সালে দু'বছর মেয়াদী ও ১৯৮৫ সালে তিন বছর মেয়াদী দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ সমাপ্ত হয় ১৯৮৮ সালের ৩১ মে। অত:পর আট বছর কেটে যায় চুক্তি শুন্য অবস্থায়। তৎকালীন বি, এন, পি সরকার দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৯২ ও ১৯৯৫ সালে দু'বার জাতিংসঘে উত্থাপন করে ও সন্তোষজনক কোন সমাধানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি [১]। উপস্থাপিত গবেষণা প্রকল্পটি, "গংগার পানি বন্টন চুক্তি: বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এর প্রভাব" দেশ ও জাতির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্ব পুর্ণ বিষয় রূপে চিত্রায়নের প্রয়াস হিসেবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

সুদীর্ঘ একুশ বছর পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের পর মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় দীর্ঘদিনের এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে ত্রিশ বছর মেয়াদী যুগান্তকারী

১.Ahmad Tariq Karim, "*Bangladesh-India Treaty on sharing of the Ganges waters : Genesis and significance*," **BIISS Journal, voll-9, No-2, April-1998, p-225.**

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক "পানি বন্টন চুক্তি" স্বাক্ষর করেছেন বিগত ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে। যা আওয়ামী লীগ সরকার তথা প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি বড় বিজয়[২]।

১.২ যৌক্তিকতাঃ ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর দীর্ঘ আট বছরপর (এর পুর্বের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে ১৯৮৮সনে) ত্রিশ বছর মেয়াদী সম্পাদিত চুক্তির বিষয়বস্তুর উপর কোন গবেষণা হয়নি। কাজেই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অগ্রগতির প্রয়োজনে গবেষণা হওয়া দরকার,এ পানি বন্টন চুক্তি কিভাবে এদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রভাব ফেলেছে এবং অর্থনীতি ও পরিবেশকে কতটুকু ক্ষতি সাধন করছে এসকল দিকগুলো অন্যকোন গবেষণায় অনুপস্থিত। বর্তমান গবেষণা প্রকল্পটির যৌক্তিকতা হলো, আর্ন্তজাতিক নদী গংগা তিনটি দেশের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত অথচ তার পানি সম্পদ উন্নয়নে দ্বি- পাক্ষিক ব্যবস্থা কেন প্রযোজ্য হবে তা অনুসন্ধান করা। বিশেষ করে ১৯৯৬ সালে ৩০ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও এতে পাঁচ বছর এবং বিশেষ প্রয়োজনে দু'বছর অন্তর যে রিভিউ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সেই ব্যবস্থার সুবাদে ভারত বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কতুটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য।

১.৩ উদ্দেশ্যঃ- আমার গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য স্বাধীনতার পর "গংগার পানি বন্টন" নিয়ে যতগুলো চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে-ঐতিহাসিক ভাবে চুক্তিগুলোর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে চুক্তির দু'পক্ষ, কে কতটুকু লাভবান হয়েছে বা হচ্ছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা এবং কারো চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায় কিনা তা বিশ্লেষণ করে বের করা। এ দেশের কোন সরকার দ্বারা যদি ভারতের স্বার্থের কখনো কোন ব্যত্যয় ঘটে তাহলে পাঁচ বছর ও দু'বছর অন্তর রিভিউর সুযোগ নিয়ে প্রতিপক্ষ চুক্তির মুল কাঠামো পরিবর্তন কিংবা চুক্তি অকার্যকর করে দিবে কিনা এবং দিলে বাংলাদেশের করণীয় বিকল্প কাজ কি হবে তা নির্ণয় করে জন সম্মুখে তুলে ধরা অভিসন্দর্ভের বিশেষ উদ্দেশ্য। কেননা আমরা জানি যে, দ্বি-পাক্ষিক কোন চুক্তির ফাঁক ফোঁকরের সুযোগ শক্তিশালী পক্ষই গ্রহণ করে থাকে। আসলে এ গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে পানিবন্টন চুক্তির প্রকৃত ইতিহাস সন্ধান করা হবে। যাতে বর্তমান ও আগামী প্রজন্ম জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সুদৃঢ় অবস্থান নিতে পারে।

২. খান মিজানুর হরমান, *"সাপ্তাহিক বিচিত্রা,"* ২০ ডিসেম্বর-,১৯৯৬, পৃ২৯-৩৫।

১.৪ সময় নির্ধারণঃ- যেহেতু বৃটিশ উপনিবেশবাদের নীল নক্শায় ১৮৫৩ সাল থেকে ফারাক্কা বাঁধ নির্মানের জন্য জরিপ কার্য শুরু হয় সেহেতু উক্ত সাল থেকে বিগত ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর গবেষণার অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

১.৫ বই আলোচনাঃ- "গংগার পানি বন্টন চুক্তি: বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এর প্রভাব " বিষয়টির উপর আলোকপাত করে তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ তিনটি গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। প্রথমটিঃ- Crow Ben, *"The Politics and technology of sharing the Ganges"* (UPL, Dhaka, 1997.) এতে গবেষক ফারাক্কা বাঁধের প্রাথমিক জরিপ বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ব্যাপক সময়ের পর্যায় ক্রমিক ঐতিহাসিক স্তর গুলো উপস্থাপন পূর্বক এর প্রকৌশলী ও প্রকৌশলগত দিক, সমস্যা সমাধানের পারস্পরিক প্রস্তাব সমুহ, আলোচনা করেছেন। এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বিতীয়টিঃ-**Begum Khurshida**, "*Tension over the Farakka Barrage*", (UPL, Dhaka, 1987.) এ গবেষণায় গবেষক ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কোলকাতা বন্দর রক্ষার দায়বদ্ধতা থেকে ফারাক্কা বাঁধ নির্মান, ফারাক্কা বাঁধ নির্মানের ঐতিহাসিক দিক ও প্রকল্প বাস্তবায়ন, একতরফা ভাবে পানি প্রত্যাহার, কি ভাবে এ সমস্যা ধীরে ধীরে ঘনীভূত হলো, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি কিভাবে প্রভাবিত হলো এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। তৃতীয়টিঃ- **Islam Rafiqul**, "*International legal Aspects: The Ganges water dispute,*" (UPL, Dhaka, 1987)এখানে গবেষক, গংগা ভারত, বাংলাদেশ ও নেপাল এই তিনটি দেশের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত বলে এটি একটি আন্তর্জাতিক নদী এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ভারত এ নদীর উপর একক সিদ্ধান্তে বাঁধ নির্মান করেছে এবং একক ভাবে যে পানি প্রত্যাহার করছে তার বৈধতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এবং ফারাক্কা বাঁধের প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন।

বই তিনটির মধ্যে প্রথমটির প্রকাশ কাল ১৯৯৩, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির প্রকাশ কাল ১৯৮৭ সালে। কিন্তু পানি বন্টন সম্পর্কে দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর। গ্রন্থ তিনটি যথাক্রমে তিন ও নয় বছর পূর্বের। অর্থাৎ পরবর্তী বছর গুলো ও দীর্ঘ মেয়াদী ৩০ বছর চুক্তি স্বাক্ষরের তথ্য সম্পর্কে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবুও পানি বন্টন চুক্তি মুল্যায়নের ক্ষেত্রে গ্রন্থ তিনটির অবদান অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

১.৬ পদ্ধতিঃ- বিশেষ উদ্দেশ্যপুর্ণ পরীক্ষণ যোগ্য পদ্ধতির মাধ্যমে ঘটনার অনুসন্ধান বা ঘটনা গুলোর সম্পর্ক আবিস্কার করে সুত্রের আকারে প্রকাশ করে কোন বৃহত্তর নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করার সুশৃংখল পদ্ধতিকে গবেষণা বলে। কোন বিষয়ে গবেষণা করতে গেলে কতকগুলো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। "গংগার পানি বন্টন চুক্তি: বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে এর প্রভাব," বিষয়টি একটি ধারাবাহিকতার ফসল তাই ঐতিহাসিক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়েছে। সুষ্ঠ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনে সংগৃহীত উপাত্তসমুহ বিন্যাস্ত করতে বিশ্লেষণমুলক ও পরিসংখ্যান মুলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

১.৭ উত্থাপিত প্রশ্ন ও উত্তরঃ- প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পে ফারাক্কা বাঁধ কেন নির্মান করা হয়েছে? কখন ও কিভাবে নির্মিত হয়েছে? ফিডার ক্যানেল কি এবং কেন? এই বাঁধ নির্মানের পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কিনা। গংগার পানি বন্টন চুক্তি: বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে কতটুকু প্রভাবিত করেছে এবং বাঁধের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও পরিবেশ কতখানি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে প্রভৃতি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে এবং এর উত্তর দেয়া হয়েছে।

১.৮ সীমাবদ্ধতাঃ ফারাক্কা বাঁধ সরেজমিনে পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি। এবং পানি বন্টন চুক্তির সরকারী (দলিল) প্রাথমিক উপাত্ত পাওয়া যায়নি। তবে যে টুকু সংসদে আলোচিত হয়েছে এবং পত্র পত্রিকা ও জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে তার উপর নির্ভর করে গবেষণা কর্ম সম্পাদন করতে হয়েছে।

১.৯ উপাত্ত সংগ্রহঃ- প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বই, সংবাদ পত্র, সাময়িকী ও জার্নাল ইত্যাদি মাধ্যম থেকে মাধ্যমিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন চুক্তির দলিল, সংসদের কার্যবলীর বিবরণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী ও সংসদ লাইব্রেরী প্রভৃতি থেকে উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে।

১.১০ প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পটি সাতটি অধ্যায়ে বিন্যাস্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়ঃ ১-প্রথম অধ্যায়টি প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পটির ভিত্তি নির্মান করেছে।

অধ্যায়ঃ ২-দ্বিতীয় অধ্যায়ে ফারাক্কা বাঁধ নির্মানের প্রেক্ষাপট ও ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে গুরুত্বপুর্ণ তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এবং সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে, কিভাবে ভারত একতরফা ভাবে গংগার পানি প্রবাহ নিজস্ব স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এ ছাড়াও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯৪৭-৭১ সাল পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার আলোচনা এবং ১৯৭১-৭৫ এর আগষ্ট পর্যন্ত ভারত ও বাংলদেশের প্রধান মন্ত্রী দ্বয়ের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনা, যৌথ ইশতেহারের মাধ্যমে Indo- Bandgladesh joint river commission গঠন এবং ১৯৭৫ সালে ঐতিহাসিক পানি বন্টনের সমঝোতার মাধমে পরীক্ষা মুলকভাবে ফারাক্কা বাঁধ প্রকল্প চালু করণ সম্পার্কিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায়ঃ ৩-তৃতীয় অধ্যায়ে ১৯৭৬ - ১৯৮২ সালের মে, মাস পর্যন্ত পানি বন্টনের পাঁচ বছর মেয়াদী প্রথম পানি বন্টন চুক্তি ১৯৭৭ স্বাক্ষর। চুক্তিটির বিভিন্ন দিক, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি নথি-পত্র ও দলিলাদির যথাযথ উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অধ্যায়ঃ ৪-চতুর্থ অধ্যায়ে জুন ১৯৮২-১৯৯০ সাল পর্যন্ত পানি বন্টন সম্পর্কিত আলোচনা এবং ১৯৮২ সালে দু'বছর ও ১৯৮৫ সালে তিন বছর মেয়াদী *Memorandum of understanding* স্বাক্ষর, স্বাক্ষরিত দলিল, বাংলাদেশ ও ভারত কর্তৃক গংগায় পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য পারস্পরিক প্রস্তাব ও এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায়ঃ ৫- পঞ্চম অধ্যায়ে ১৯৯১- ৯৫ সাল এবং ১৯৯৬ জুলাই থেকে ডিসেম্বর ১৯৯৬ পর্যন্ত পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে ঐতিহাসিক ত্রিশ বছর মেয়াদী পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষর, স্বাক্ষরিত চুক্তির বিভিন্ন দিক, বিশেষ করে ১৯৮৮ সালের পর দীর্ঘ আট বছর চুক্তি শুণ্য থাকায় চুক্তি

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে কোন আশা নয় বরং প্রবল হতাশাই সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে দু'টি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং বিভেদই প্রায় স্থায়ী রূপ পেয়ে গিয়েছিল। যা রাজনৈতিক ভাবে এদেশের জনগণকে ভারত বিরোধী হতে সাহায্য করেছে। পক্ষান্তরে হঠাৎ করে সরকার পরিবর্তনে এবং ত্রিশ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর বিশেষ রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে। অর্থাৎ চুক্তিটি দীর্ঘ মেয়াদী হওয়ায় *Anti- Indian sentiment* লাঘবে সাহায্য করবে কিনা তা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আগের চুক্তির সাথে তুলনা মুলক আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায়ঃ ৬-ষষ্ঠ অধ্যায়ে ফারাক্কা বাঁধ নির্মান করে ভারত কর্তৃক একতরফা ভাবে পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রভাব এবং অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নিরুপনের জন্য বিভিন্ন পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও এ অধ্যায়ে বাঁধ নির্মানে বাংলাদেশ সহ আঞ্চলিক পরিবেশ কিভাবে দুষিত হচ্ছে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

অধ্যায়ঃ ৭- শেষ অধ্যায়ে যুক্ত হয়েছে উপসংহার।

১.১১ উপসংহারঃ- নদীর পানি নিয়ে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সংগে বিরোধ বাংলাদেশের জন্য একটি জাতীয় সমস্যা। এটি এমন এক আবেগময় এবং সংবেদনশীল বিষয় যা সীমান্তের দু'ধারের মানুষের মনকে বিশেষ ভাবে নাড়া দেয়। কারিগরী দিক থেকে সমস্যাটি আরো জটিল কিন্তু একে আরো জটিল করেছে উপমহাদেশের দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকালের অবিশ্বাস ও দ্বন্দের ইতিহাস এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। এ সমস্যার দীর্ঘ মেয়াদী কোন সমাধান না হওযার বড় কারণ ভারত সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। যখন আলোচনায় কোন অগ্রগতি বা স্বল্প মেয়াদী সমঝোতা হয়েছে তখন তা হয়েছে রাজনৈতিক বাধ্য বাধকতা বা আন্তর্জাতিক চাপের কারণে। বিলম্বে হলেও এই প্রথম বারের মত রাজনৈতিক সদিচ্ছার ফলে ঐতিহাসিক ত্রিশ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এটি একটি মাইল ফলক তথা বিরল দৃষ্টান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর দরিদ্রতম অঞ্চলে আমাদের বসবাস, এ অঞ্চলের বড় প্রয়োজন তার দরিদ্র, অনাহারক্লিষ্ট ও গৃহহীন কোটি কোটি নিরন্ন মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি ও উন্নত জীবন যাত্রা নিশ্চিত করা। এ প্রচেষ্টায় কোন রকম বিলম্ব করা আমাদের পক্ষে হবে কর্তব্যের গুরুতর অবহেলা। কাজেই দু'টো রাষ্ট্রই যদি প্রতিবেশী সুলভ মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসে এবং বৃহৎ দেশটি যদি সহযোগিতার হাত বাড়ায় তবে যে কোন সমস্যাই অমিমাংসিত থাকে না বিগত ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬-এ প্রমানিত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-২

ফারাক্কা বাঁধ নির্মানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ভৌগলিক অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

ফারাক্কা বাঁধ নির্মানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

গংগার পানি নিয়ে বিরোধ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার বহু আগে। ভারতীয় পুরান কাহিনীতেও এই পানি নিয়ে আছে বিরোধ। সেখানে গংগা যখন স্বর্গে ছিলেন তখন তাকে নিয়ে কোন বিরোধ ছিল না। স্বর্গে তার নাম ছিল "অলকানন্দা"। রাজা ভাগীরথের কঠিন সাধনায় শিবের জটায় ভর করে গংগা যখন মর্ত্যে অবতীর্ন হলেন তখনও কোন বিরোধ তৈরী হয়নি। কিন্তু গংগা যখন ছুটতে ছুটতে জহ্নু নামের এক ধ্যান মগ্ন মহা মুনির ফুল তন্ডুল ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখনই সূচনা ঘটে বিরোধের। ধ্যান ভঙ্গ হয় মুনির। মুনি তখন গন্ডুষ ভরে পান করেন গংগাকে। সেই প্রথম বন্দী হল গংগা[১]।

ফারাক্কা বাঁধ নির্মানের পিছনে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল কোলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষা করা। গংগা নদী থেকে বের হওয়া ভাগীরথী বা হুগলী নদীর তীরে ১৬৯০ সালে 'জব চার্নক' যখন কোলকাতা বন্দরের গোড়া পত্তন করেন তখন থেকেই হুগলী নদীতে পানির প্রবাহে টান পড়া শুরু হয়েছে। দেড়শ বছর ধরে বৃটিশদের সমীক্ষা শেষে ১৯৫১ সালে হুগলী নদীতে পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য যখন ফারাক্কা পয়েন্টে বাঁধ নির্মানের সিদ্ধান্ত পাকা পাকি হয় তখন ভারত স্বাধীন। আর গংগা নদী স্বীকৃত একটি আন্তর্জাতিক নদী হিসেবে। কারন ফারাক্কা পয়েন্টের সামান্য ভাটি থেকে গংগার একটি ভাগ ভাগীরথী নামে প্রবাহিত হতো। মূল শাখা পদ্মা নামে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশে[২]।

নিম্নে সারণী- ২.১ এ ফারাক্কা বাঁধ নির্মানের জরিপ মতামত ধারাবাহিক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

১. খান মিজানুর রহমান, " *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*", ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৬, পৃ ২৯-৩৫।

২. Abbas B.M. A.T. " *The Ganges Waters Dispute.*"(UPL, Dhaka, 1982), P-.5.

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২.১

হুগলী নদী সম্পর্কিত জরিপ মতামত রিপোর্ট ১৮৫৩-১৯৫২।

সন	রিপোর্ট দাতা	রিপোর্ট/মতামত
১৮৫৩ এবং ১৮৫৮	প্রকৌশলী এ,কটন লন্ডন	গংগা বাঁধ নির্মান করা, যাতে এর উজানে পানি সংরক্ষন করা যায়।
১৮৫৩ - ১৮৫৪	বেঙ্গল গভর্নমেন্ট অনুসন্ধান রিপোর্ট	কোলকাতায় বিকল্প বন্দর নির্মাণ।
১৮৬১ - ১৮৬২	প্রকৌশলী জে.এ.লংগ্রীজ.লন্ডন	কোলকাতায় বিকল্প বন্দর নির্মান।
১৮৬৪	এইচ, লিউনার্দো লন্ডন	গংগা বাঁধ নির্মান(যদিও কঠিন ও অনিশ্চিত)।
১৮৯৬ এবং ১৯০৫	এল,এফ, ভার্নোন হারকোর্ট প্রকৌশলী লন্ডন	নদী প্রশিক্ষন।
১৯১৬ - ১৯১৯	ষ্টিফেন মুর, লন্ডন	নদী খনন, প্রশিক্ষন এবং হুগলী নদীতে পানি সরবরাহের উৎস মুলের ব্যবস্থাপনা।
১৯৩০	উইলিয়াম উইলককস, লন্ডন	গংগা বাঁধ নির্মান প্রথমত: কৃষি উন্নয়নের স্বার্থে দ্বিতীয়ত: হুগলী নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি।
১৯৩৯	টি,এম,অগ, পোর্ট কমিশনার	হুগলী নদীর পানি প্রবাহের উৎস স্থল নিয়ন্ত্রন করা।
১৯৪৫	এ,ওয়েবেষ্টার পোর্ট কমিশনার	গংগা বাঁধ নির্মান।
১৯৪৬ - ১৯৪৭	প্রকৌশলী রেনডেল	গংগা বাঁধ ও শিপ ক্যানেল নির্মান।
১৯৫২	মানসিংহ বিশেষজ্ঞ কমিটি	গংগা বাঁধ নির্মান ও নদী প্রশিক্ষন।

(**Source:** Crow Ben, "*Sharing the Ganges*",(U P L, Dhaka, 1997),P-35.)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ পাকিস্তানের প্রদেশ থাকা কালীন ১৯৫১ সালে ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মানের প্রকল্প হাতে নেয় এবং এ খবর প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হওয়ার পাশাপাশি বিভক্ত হয় পানিও। কাজেই তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এর প্রতিবাদ জানায়। কারন এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এরূপ কোন পরিকল্পনা হাতে নেয়ার পূর্বে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসা ভারতের একটি অলংঘনীয় দায়িত্ব ছিল। প্রতিবাদের উত্তরে ভারত পরের বছর জানায় যে, গংগার বাঁধ নির্মান এখনো তদন্ত ও অনুসন্ধান পর্যায়ে রয়েছে। ১৯৬০ সালে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে প্রথম এ প্রসঙ্গে বৈঠকে বসে। আলোচনা চলাকালে এরই মধ্যে ভারত প্রকল্পটির প্লান চূড়ান্তভাবে গ্রহন করে[৩]। নিম্নে সারণী-২.২ এ ফারাক্কা বাঁধ নির্মানের পর্যায় ক্রমিক পদক্ষেপ সমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণী-২.২

ফারাক্কা বাঁধ নির্মানের পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ সমুহঃ

সন	মাস	পদক্ষেপ
১৯৪৭	--	পশ্চিম বঙ্গ সরকার ফারাক্কা প্রকল্প অনুসন্ধান শুরু করে এবং মাঠ পর্যয়ে জরীপ সহ প্রতিবেদন তৈরী করে।
১৯৪৯	--	ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুসন্ধান কাজ সম্পন্ন
১৯৫২	--	মানসিংহ কমিটি কর্তৃক পর্যলোচনা, মডেল স্টাডি এবং প্রকল্পের সুপারিশ।
১৯৫২-৫৮	--	লোক সভায় পশ্চিম বঙ্গের এম,পি কর্তৃক চাপ প্রয়োগ

৩. Swain Ashok, *"The Environmental Trap"*, Report No-44, 1995 (Uppsala University, sweden), P.P.37, 38.

সন	মাস	পদক্ষেপ
১৯৫৬	--	প্রাথমিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে একটি বিশেষ সেল গঠন এবং কেন্দ্রীয় ওয়াটার এন্ড পাওয়ার কমিশনকে প্রকল্প অনুসন্ধানের দায়িত্ব প্রদান।
১৯৬০	মার্চ	নেহেরু পশ্চিম বঙ্গের মুখ্য মন্ত্রীকে নিজস্ব পরিকল্পনা মত প্রকল্প গ্রহন করা হবে বলে আশ্বাস দেন।
১৯৬০	এপ্রিল	অর্থবরাদ্দ, প্রশাসনিক অনুমোদন এবং অনুসন্ধান সার্কেল গঠন।
১৯৬১	জানুয়ারী	জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রকল্প গ্রহন এবং পাকিস্তান সরকারকে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে বলে জানান হয়।
১৯৬১	জুন আগষ্ট অক্টোবর	ফারাক্কা বাঁধ নিয়ন্ত্রন বোর্ড গঠন, প্রকৌশলগত উপদেষ্টা কমিটি গঠন। আর, বি, চক্রবর্তী চীফ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত।
১৯৬২	--	হাইড্রোলিক ষ্টাডি ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা এবং ডাইভারশনে সম্ভাব্য পানির পরিমান নির্ণয় করার অনুসন্ধানের দায়িত্ব প্রদান।
১৯৬৩	সেপ্টেম্বর	ডঃ কে,এল, রাও কর্তৃক বাঁধ নির্মানের স্থান নির্বাচন
১৯৬৩	অক্টোবর	মুখার্জী কর্তৃক চক্রবর্তীকে পুনরায় চীফ ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিয়োগ।
১৯৬৪	--	বাঁধ নির্মানের কার্যক্রম শুরু।

(Source :- Crow Ben, "*Sharing the Ganges*", U.PL, Dhaka, 1997 P.56.)

Dhaka University Institutional Repository

পারস্পরিক আলোচনা ব্যতীত যখন প্রকল্পটির কাজ এগিয়ে যাচ্ছিল তখন পাকিস্তান বিষয়টি জাতিসংঘের *Advisory and technical service* এর নিকট উপস্থাপনের কথা বলে। কিন্তু ভারত এটাকে দ্বি-পাক্ষিক বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে সমাধানের উল্টো প্রস্তাব দেয়। ১৯৬০ সালের জুন থেকে ১৯৬২ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত চারটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ভারত এক পাক্ষিক সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৬১ সালে বাঁধের কার্যক্রম চালু করে। এবং ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের আগে ও পরে এ নিয়ে দু'দেশের মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা হয়[৪]।

১৯৬৭ সালের মে মাসে পাকিস্তান সরকার কোন অগ্রগতি না দেখে বিষয়টি দ্বি-পাক্ষিক স্বীকৃতির পরিবর্তে আন্তর্জাতিক হিসাবে ঘোষনা করে। এবং বিষয়টি *International water for peace canference* ওয়াশিংটনে উত্থাপন করে ৯২টি সদস্য দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে। পাকিস্তান সরকার ফারাক্কা বাঁধ নির্মানকে তার নিরাপত্তার হুমকি এবং পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি ও সেচের মারাত্মক হুমকি বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু ভারত সরকার এতে কোন কর্নপাত না করে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যায়। সারণী-২.৩ এ ফারাক্কা বাঁধ সম্পর্কিত পর্যায়ক্রমিক বিতর্ক দেখানো হয়েছে[৫]।

সারণী-২.৩ ফারাক্কা বাঁধ সম্পর্কিত পর্যায়ক্রমিক বিতর্ক ১৯৬১-৭১

সন	মাস	বিষয়
১৯৬১	জানুয়ারী	পাকিস্তান আনুষ্ঠানিক ভাবে ফারাক্কা বাঁধ নির্মানে প্রতিবাদ জানায়।
	মার্চ	আইউব-নেহেরু লন্ডনে বৈঠক।
	এপ্রিল	তৃতীয় বিশেষজ্ঞ মিটিং কোলকাতা এবং লোক সভা জানায় যে, পাকিস্তানের প্রতিবাদে প্রকল্প বাতিল করা হবেনা।

৪. Swain Ashok, "*The Environmental trap*", Report no- 44, 1995,(Uppsala university sweden),-p .38.

৫. *Ibid. P-38.*

Dhaka University Institutional Repository

সন	মাস	বিষয়
	জুলাই	যৌথ বাঁধ প্রকল্প প্রস্তাব ভারত কর্তৃক নাকোচ।
	আগষ্ট	ভারতের লোক সভায় বিতর্ক বা আলোচনা।
	ডিসেম্বর	চতুর্থ বিশেষজ্ঞ মিটিং ঢাকায়।
১৯৬২	নভেম্বর	পাকিস্তান কর্তৃক মন্ত্রী পর্যায়ে মিটিং এর প্রস্তাব।
১৯৬৩	মে	পাকিস্তান কর্তৃক মন্ত্রী পর্যায়ে পুনরায় মিটিং এর প্রস্তাব।
১৯৬৪	- - - -	সীমান্ত এলাকায় গংগা তীরে যৌথ জরীপ।
১৯৬৫	মে	পাকিস্তান চূড়ান্ত বিশেষজ্ঞ মিটিং এর জন্য পুন: তাগাদা প্রদান করে।
	আগষ্ট	ভারত একটি বিশেষজ্ঞ মিটিং করতে সম্মত হয়।
	সেপ্টেম্বর	পাক- ভারত যুদ্ধ।
১৯৬৭	মে	পাকিস্তান বিষয়টি ও য়াশিংটনে Water for peace conference এ উপস্থাপন করেন।
	অক্টোবর	পাকিস্তান আরো একটি বিশেষজ্ঞ মিটিং এর ব্যাপারে অনুরোধ জানায়।
১৯৬৮	জানুয়ারী	আর একটি মিটিং এর ব্যাপারে সম্মত চুক্তি।
	মে	পঞ্চম বিশেষজ্ঞ মিটিং নতুন দিল্লীতে, পাকিস্তান মন্ত্রী পর্যায়ে মিটিং এর পুন: চাপ দেয়।
	জুলাই	কসিগীন (রাশিয়া) কর্তৃক শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নিকট পত্র যাতে তিনি সিন্দু নদের সিদ্ধান্তের মত ফারাক্কা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে বলেন,
	সেপ্টেম্বর	পাকিস্তান কর্তৃক জাতিসংঘ সাধারন পরিষদে উথাপন।
	ডিসেম্বর	সচিব পর্যায়ে প্রথম মিটিং

Dhaka University Institutional Repository

সন	মাস	বিষয়
১৯৬৯	মার্চ	সচিব পর্যায়ে প্রথম মিটিং সিদ্ধান্ত ছাড়া শেষ।
	জুলাই	তৃতীয় সচিব পর্যায়ে দ্বিতীয় মিটিং নতুন দিল্লী।
১৯৭০	ফেব্রুয়ারী	সচিব পর্যয়ে ৪র্থ মিটিং , ইসলামাবাদ।
	এপ্রিল	জয় প্রকাশ নারায়ন ও অন্যান্য গন কর্তৃক সিন্দু নদীর মত সিদ্ধান্ত গ্রহনে আপত্তি জানান।
	জুলাই	সচিব পর্যায়ে পঞ্চম মিটিং নতুন দিল্লী।
	জানুয়ারী	সচিব পর্যায়ে আরো একটি মিটিং এর চুক্তি।
১৯৭১	মার্চ	বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু।
	ডিসেম্বর	ভারতীয় সহযোগিতায় বাংলাদেশ পাকিস্তান যুদ্ধ শেষ।

(Souice: Crow Ben, "*Sharing the Ganges,*" UPL , Dhaka, 1997, P.86.)

পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী শরীফুদ্দিন পীরজাদা পাকিস্তান National Assembly তে এক প্রশ্নের জবাবে ভারতের সমালোচনা করে বাঁধ নির্মানের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে বলেন ঃ-

(১) ফারাক্কা প্রকল্পটি পূর্ব পাকিস্তানের পানি সরবরাহ অন্যদিকে প্রবাহিত করে পূর্ব পাকিস্তান কে পানির ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করবে যাতে তার উন্নতি চরম ভাবে বিঘ্নিত হয়।

(২) বাঁধের ফলে গঙ্গা কপোতাক্ষ প্রকল্পের কুষ্টিয়া, যশোর এবং খুলনা জেলার দুই লক্ষ মিলিয়ন একর জমির ফসল বিপন্ন হবে।

(৩) বর্ষা শেষে শুষ্ক মৌসুমে শস্যাদির মারাত্মক ক্ষতি হবে এবং প্রায়োজনীয় পানির স্তর নিচে নেমে যাবে। ফলে কৃষি সম্পদের অবস্থা মারাত্মক রূপ নেবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) গঙ্গা এবং তার শাখা নদী গুলো বিশেষ করে গৌরি ও মধুমতি তার নাব্যতা হারাবে এবং নৌ-চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে।

(৫) বর্ষার মৌসুমে ভারতে হুগলী নদীর অতিরিক্ত ১০,০০,০০০ কিউসেক পানি গেট দিয়ে ছেড়ে দিয়ে বন্যা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

(৬) বর্ষা কালে পলি যুক্ত পানি পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে নদীর ধারন ক্ষমতা হ্রাস করবে । ফলে নদী তার নাব্যতা হারাবে এবং বন্যা সমস্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধিপাবে।

(৭) পানি প্রত্যাহারের ফলে খুলনা ও বরিশাল এর কোষ্টাল এলাকা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এ সকল এলাকায় লোনা পানি ঢুকে কৃষি ক্ষেত্র নষ্ট করে দিবে এবং শহর ও গ্রামে খাবার পানি ও শিল্প কারখানায় পানির সংকট দেখা দিবে।

উল্লেখিত সমালোচনার জবাবে ২৪ জুন ১৯৬৭ ভারতের কৃষি মন্ত্রী ভারতীয় পার্লামেন্টে বলেন, "পাকিস্তানী সমালোচনার ফলে ভারত তার পরিকল্পনা বাদ দিবে না এমন কি কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধনও করবে না" অত:পর দ্বি-পাক্ষিক কয়েক দফা আলোচনার পরও কোন সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব হয়নি[৬] ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত যে অব্যাহত সহযোগিতা করেছিল তার মধ্য দিয়ে প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর ভারত পানি সমস্যা নিয়ে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনার মাধমে সমস্যা নিরসন করবে[৭]। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ভারত হয়ে যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তিনি জরুরী ভিত্তিতে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করেন[৮] ।

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে দুই দেশের প্রধান মন্ত্রী একটি যৌথ ঘোষনা প্রদান করেন। এ যৌথ ঘোষনায় *Indo- Bagladesh joint Rivers commission* গঠনের কথা বলা হয়। ঘোষনায় আরো বলা হয় যে,দু'দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পারস্পারিক সৌহাদ্য প্রতিষ্ঠার জন্য এ সিদ্ধান্ত অতীব জরুরী।

৬. *Ibid, P-39.*
৭. *Ibid, P-39.*
৮. Ahmad Tariq Karim, "*The Bangladesh-India Treatry on Sharing of the Ganges Water's: Genesis and significance.*" **BIISS Journal**, Vol-9, no-2, p- 219.

Dhaka University Institutional Repository

(১) *J.R.C*-এর মধ্যে দু'দেশের বিশেষজ্ঞ গন অর্ন্তভুক্ত থাকবেন যারা স্থায়ী ভিত্তিতে ব্যাপক ভাবে জরিপ কার্য সম্পন্ন করে বন্যা নিয়ন্ত্রন এবং শুস্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য হিস্যা সম্পর্কে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে পরামর্শ দিবে।

(২) দু'দেশের বিশেষজ্ঞ গণ বন্যার আগাম সতর্ক সংকেত, কিভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রন করা যায়, কিভাবে কৃষি উন্নয়ন করা সম্ভব এবং পানি প্রবাহের মাধ্যমে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন করে কিভাবে দু'দেশের উন্নয়ন তরান্বিত করা সম্ভব এ সকল বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রকল্প হাতে নিতে হবে। আর তাহলেই কেবল মাত্র এই অঞ্চলের পানি সম্পদ সমবন্টন হবে এবং দুই'দেশের জনগন সমভাবে উপকৃত হবে।

উক্ত ঘোষনায় দু'দেশের প্রধান মন্ত্রীদ্বয় তাদের গভীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করে পানি বন্টনের ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, শান্তি ও বন্ধুত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করেন[৯]।

১৯৭৪ সালের মে মাসে দু'দেশের প্রধান মন্ত্রী পুনরায় গংগার পানি সমস্যা নিয়ে নতুন দিল্লীতে বৈঠকে বসেন। মিটিং শেষে ১৬ মে ১৯৭৪ সালে তারা আবারো একটি যৌথ ঘোষনা প্রদান করেন। ঘোষনায় বলেন, গংগায় পানি প্রবাহ নুন্যতম কিংবা অতিরিক্ত প্রবাহ না থাকলে শুস্ক মৌসুমে কোলকাতা বন্দরের প্রয়োজন মিটানোর পর বাকী পানি প্রবাহ দ্বারা বাংলাদেশের প্রয়োজন মিটানো হবে। দু'দেশের প্রধান মন্ত্রী *J.R.C* কে এ অঞ্চলের পানি প্রবাহ কিভাবে সর্বাধিক ভাবে দু'দেশের প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায় সে ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেন। দু'পক্ষ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, ফারাক্কা বাঁধ নির্মানের পূর্বে যে ভাবে পানি প্রবাহ ছিল সমঝোতার মধ্যে দিয়ে নুন্যতম প্রবাহ কালীন গংগায় পানি দু'দেশ সেভাবে পাবে[১০]।

ফারাক্কা বাঁধের ভৌগলিক অবস্থান

১৯৭০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে ২১৯টি নদীর পানি বিরোধ সমস্যার সাথে যুক্ত হয় গংগার নাম। গংগা পৃথিবীর বৃহত্তম নদী গুলির একটি। এ নদীর সাথে জড়িত রয়েছে এ অঞ্চলের অর্থনীতি, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

৯. *Ibid, P-220.*
১০. *Ibid, P-221.*

Dhaka University Institutional Repository

নদীটি হিমালয়ের দক্ষিণ প্রান্তে গঙ্গোত্রী এলাকায় উৎপন্ন হয়ে ভারতের ৭৫০ মাইল বুক চিরে বাংলাদেশে ঢুকেছিল পদ্মা নামে[১১]। ফারাক্কা বাঁধ এই গংগা নদীর উপর ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার রাজমহল ও ভগবান গোলা এলাকায় অবস্থিত[১২]। বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্ত থেকে ১৭ কিলোমিটার উজানে গংগা নদীর উপর ফারাক্কা নামক স্থানে ভারত যে বাঁধ নির্মান করে তা ফারাক্কা বাঁধ নামে খ্যাত। স্থানের নাম অনুসারে ফারাক্কা বাঁধটির নাম করন করা হয়েছে[১৩]। বাংলাদেশের মানুষের কাছে ফারাক্কা বাঁধ- মরন ফাঁদ হিসাবে চিহ্নিত।

১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে ফারাক্কা বাঁধের নির্মান কাজ সমাপ্ত হয়, এই ফারাকা বাঁধের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ-

১। রোড কাম রেল সেতু সহ গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা নামক স্থানে আড়া আড়ি বাঁধ নির্মিত হয়।

২। গংগার ডান তীরে সংযোগ খালের জন্য রয়েছে একটি হেড রেগুলেটর।

৩। এই হেডরেগুলেটর থেকে শুরু হয়েছে সংযোগ খাল।

৪। হুগলী ভাগীরথী নদীর উপর জঙ্গীপুর নামক স্থানে একটি বাঁধ নির্মান করা হয়।

৫। নৌ-চলাচলের জন্য এতে রয়েছে ৪টি নেভিগেশন লক এবং

৬। ফিডার ক্যানেলের উপরও রয়েছে রোড কাম রেল সেতু।

নিম্নোক্ত সারণী-২.৪ এ ফারাক্কা বাঁধের প্রকৌশল গত তথ্য। উপস্থাপন করা হয়েছে।

১১. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৬।
১২. **খান মিজানুর রহমান,** *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৬, ২৯-৩৫ ।
১৩. Islam Rafiqul, "*The Effect of the Farakka Barrage on Bangladesh and Inter national Law,*" "**Biiss Journal**," Vol-5 July-1984, P-251.

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২.৪

ফারাক্কা বাঁধের প্রকৌশল গত তথ্য

ফারা ক্কা বাঁধের দৈর্ঘ্য	২২৪০.৪০ মিটার
উচ্চতা	২৩ মিটার
গেটের সংখ্যা	১০৯ টি
গেটের প্রস্থ	১৮ মিটার
খাদের গভীরতা	২২ মিটার
ডিসচার্জ	৭,০০,০০০ কিউসেক
ফিডার ক্যানেলের দৈর্ঘ্য	৩৮.৩৮ কি: মি:
প্রস্থ	১৫০.৮৮ মিটার
গভীরতা	০৬ মিটার
বহন ক্ষমতা	৪০,০০০ কিউসেক

(**Source:** Y.K. Murthi, Souvenir; Farakka Barrage 21 may 1975, Calcutta, p- 11.)

মূল বাঁধের কাজ শুরু হয় ৩০ জানুয়ারী ১৯৬১ এবং কাজ শেষ হয় ১৯৭০ সালে। এতে ব্যয় হয় ১৫৬ কোটি ভারতীয় রুপি। এ বাঁধ ২৭ লাখ কিউসেক পানি প্রবাহিত করতে সক্ষম। এছাড়া ফিডার ক্যানেলের কাজ শুরু হয় ১৯৭১ সালে এবং শেষ হয় ১৯৭৪ সালে এতে ব্যয় হয় ৪৪ কোটি ভারতীয় রুপী। একটানা ১৩ বছর ধরে ফারাক্কা বাঁধ প্রকল্প নির্মানের কাজ চালিয়ে পুরো প্রকল্প সম্পন্ন করতে ভারতের দুই শত কোটি ভারতীয় রুপী খরচ হয়[১৪]।

১৪. খান মিজানুর রহমান, _সাপ্তাহিক বিচিত্রা_. ২০ডিসেম্বর, ১৯৯৬ পৃ ২৯-৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ফারাক্কা সমস্যা নিয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলে ভারত ইতিবাচক সাড়া দেয়। এরই সূত্র ধরে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ১০ জানুয়ারী পাকিস্তানী কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে যখন ভারত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন নতুন দিল্লীতে যাত্রা বিরতি কালে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে এ সম্পর্কে কথা বলেন। এ সময় পানি বিশেষজ্ঞ বি, এম, আব্বাস এবং মি: কে, এল, রাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একই সালের মার্চ মাসে ভারত - বাংলাদেশ সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর এপ্রিল মাসে 'যৌথ নদী কমিশন' (JRC) গঠন করা হয়[১৫]।

১৯৭২ সালের জুন মাসে যৌথ নদী কমিশনের প্রথম এবং ডিসেম্বরে দ্বিতীয় মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে দু'দেশের পানি সম্পদ মন্ত্রীর আলোচনায় ভারত এক তরফা ভাবে ফারাক্কার পানি প্রত্যাহার না করায় সম্মত হয়। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে দু'দেশের বিদেশ সচিব, ফেব্রুয়ারী মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ঢাকায় এ নিয়ে আলোচনায় বসেন। এবং মে মাসে শেখ মজিবুর রহমার ও শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী দিল্লীতে সাক্ষাৎ করেন।

অত:পর যৌথ নদী কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনায় শুস্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ সম্পর্কে আলোচনা হয়। এ ভাবে কয়েক দফা আলোচনা শেষে দু'দেশ ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল শুস্ক মৌসুমের ৪০দিন পানি ভাগা ভাগির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সে মোতাবেক ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বল্প মেয়াদী সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে ফারাক্কা বাঁধ পরীক্ষা মূলক ভাবে চালু হয়[১৬]। পরীক্ষা মূলক চালু হওয়ার সময় দু'দেশ নিম্নোক্ত সারণী-২.৫ অনুযায়ী পানি বন্টনের সমঝোতায় উপনীত হয়।

১৫. **Abbas B.M. AT.** "*The Ganges waters dispute,*" UPL. Dhaka, 1982, P- 122.
১৬. **Swaln Ashok** , "*The Environmental Trap,*" Report No- 44, 1995, Uppsala University, Sweden, P- 40.

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-২৫

১৯৭৫ সালের স্বল্প মেয়াদী সমঝোতা স্মারক

(কিউসেক হিসাবে অংশ)

১০(দশ)দিন হিসাবে	ফারাক্কায় নির্ভর যোগ্য পানি প্রবাহ	হুগলী নদীর জন্য সম্মত অংশ	বাংলাদেশে জন্য প্রাপ্য অংশ
২১ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল ১৯৭৫	৫৫,০০০	১১,০০০	৪৪,০০০
১ মে থেকে ১০ মে ১৯৭৫	৫৬,৫০০	১২,০০০	৪৪,৫০০
১১ মে থেকে ২০মে ১৯৭৫	৫৯,২৫০	১৫,০০০	৪৪,২৫০
২১ মে থেকে ৩১ মে-১৯৭৫	৬৫,৫০০	১৬,০০০	৪৯,৫০০

(**Source:** Crises on Ganges, Government of peoples Republic of Bangladesh, 1976, p- 1)

ভারত ফারাক্কা বাঁধ নির্মানের মাধ্যমে যে পরিমান পানি প্রত্যাহারের পরিকল্পনা করেছিল ১৯৭৫ সালের সমঝোতা মোতাবেক শুস্ক মৌসুমে তার চেয়ে অনেক কম পানি প্রত্যাহার করেছিল। ভারত এ সময় এ ব্যাপারে এতো নমনীয় ছিল যে, যৌথ সহযোগিতার ক্ষেত্রে তা নজিরবিহীন। কিন্তু ভারত ও বাংলাদেশের সাধারন জনগন এটাকে স্বাভাবিক চোখে দেখেনি। ভারতের তৎকালীন বিরোধী দল গুলি শুস্ক মৌসুমে ১১,০০০ -১৬,০০০ কিউসেক পানি থেকে ৪,০০০ কিউসেক পানি হুগলী নদীর লবনাক্ততা দূর করতে সক্ষম হবে না বলে অভিমত প্রকাশ করে। একই সময় বাংলাদেশের বিরোধী দল গুলি এটাকে শেখ মুজিব সরকারের বাংলাদেশের বিপক্ষে ভারত নীতি অনুসরনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে[১৭]।

১৭. *Ibid* P-41.

Dhaka University Institutional Repository

যৌথ পর্যবেক্ষন ও প্রবাহ বৃদ্ধিঃ-

স্বল্পমেয়াদী চুক্তি শেষ হবার পরে দু'দেশের জনগণের সমালোচনা ও দাবির পরিপ্রেক্ষিতে দু'সরকার ঠিক করে যে, বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত কমিটি উভয় দেশের বিভিন্ন উপযুক্ত স্থানে ফারাক্কার পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের উপর প্রতিক্রিয়া এবং কোলকাতা বন্দরের সুবিধার্থে হুগলী নদীতে প্রভাহিত পানির প্রভাব পর্যবেক্ষণ করবেন। সরবরাহ কালে পানি প্রবাহের মাত্রা ও অবশিষ্টাংশ বাংলাদেশ প্রবাহ রেকর্ড করার জন্য ফারাক্কাতে একটি যৌথ কমিটি নিযুক্ত করেন। কমিটি গুলি উভয় সরকারের নিকট তাদের রিপোর্ট বিবেচনার জন্য পেশ করবেন।

যথা সময়ে ফারাক্কা পয়েন্টে দু'দেশের বিশেষজ্ঞ কমিটি মোতায়েন করা হয় নদীতে যা পানি আসে তা পরিমাপ করার জন্য হুগলী নদীতে ফিডার ক্যানেল দিয়ে এবং ব্যারাজের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের দিকে কতটা পানি প্রবাহিত হল তা নির্ণয় করার জন্য। এই সংগে হার্ডিঞ্জ ব্রীজে বাংলাদেশের কত পানি আসে তা দেখার জন্য ভারতীয় দল নিযুক্ত হয়। হুগলীতে গংগার পানির প্রভাব দেখার জন্য ভারতীয় দল নিযুক্ত হয়। হুগলীতে গংগার পানির প্রভাব দেখার জন্য এক বাংলাদেশ দলও খুলনাতে লবনাক্ততা কতটা বাড়ে তা দেখার জন্য এক ভারতীয় দল থাকে। অবশ্য এ সবে কিছু লাভ হয়নি। কারন এই পর্যবেক্ষন আরম্ভ হয় ২১ এপ্রিল থেকে যখন শুকনো মৌসুমের শেষের দিকে এবং নদীতে সে সময়ে পানি বাড়তে শুরু করে। ফারাক্কাতে নদীর পানির মাপ নিয়েও দু'দেশের মতানৈক্য হয় এবং দু'দেশের পর্যবেক্ষন দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে কিছুটা তিক্ততা দেখা দেয়[১৮]।

গংগায় শুস্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ প্রস্তাব দেয় যে, গংগাতে বর্ষার এত পানি আসে যে এর কিছুটা ধরে রাখতে পারলে তার শুস্ক মৌসুমের চাহিদা অনায়াসেই মেটানো সম্ভব। এর জন্য দরকার ষ্টোরেজ ড্যাম নির্মান বা পানি ধরে রাখার জন্য সংরক্ষনাগার তৈরী করা। এ রকম সংরক্ষনাগার তৈরী হতে পারে শুধু মাত্র নদীর অববাহিকা পাহাড়ি অঞ্চল নেপাল ও ভারতে। ভারত এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে অভিমত রাখে যে, যৌথ নদী কমিশন দ্বি-পাক্ষিক এবং এতে তৃতীয় কোন দেশ-নেপালকে আনা যাবেনা। বাংলাদেশের মতামত হলো এটা করা যায় দু'সরকারের সম্মতি নিয়ে। ভারত

১৮. আব্বাস বি, এম এটি, "ফারাক্কা ব্যারাজ ও বাংলাদেশ", (ইউ, পি, এল, ঢাকা, ১৯৮৮), পৃ ৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

পাল্টা প্রস্তাব দেয় যে, এটা করা যায় বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে আসামে ব্রহ্মপুত্র থেকে ফারাক্কার উজানে গংগার সঙ্গে একটি বিরাট সংযোগ খাল খনন করে ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি গংগায় প্রত্যাহারের মাধ্যমে। ভারতের যুক্তি, গংগার পানি হুগলী সহ গংগার অববাহিকার বাইরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চাহিদা মেটানোর জন্য দরকার এবং গংগায় বর্ষার পানি ধরে রেখেও তার চাহিদা মিটবে না।

ভারতের সংযোগ খাল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের যুক্তি প্রথমত: গংগা নদীর বর্ষার পানি সংরক্ষন করে নেপাল, ভারত ও বংলাদেশ এই তিনটি দেশেরই চাহিদা মিটানো যায়। এর জন্য ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি গংগাতে নেয়ার কোন প্রশ্নই উঠেনা। দ্বিতীয়ত: এমনিতেই ভারত গংগার পানি নির্বিচারে ব্যবহার করাতে বাংলাদেশে পানির অভাব দেখা দিয়েছে এবং লোনা পানির প্রকোপ বেড়েছে। এর পর যদি ব্রহ্মপুত্রের পানিও কমানো হয় তবে বাংলাদেশের সমূহ ক্ষতি হবে।

তৃতীয়ত: ব্রহ্মপুত্র থেকে পানি গংগায় নেয়ার জন্য সংযোগ খাল খনন করলে তা হবে বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে আড়াআড়ি আরও একটি বিশাল নদীর সৃষ্টি। এই খাল উত্তর বঙ্গকে কেবল দু' ভাগেই বিভক্ত করবে না বরং এতে প্লাবন ও পানি বদ্ধতা সৃষ্টি করবে। অধিকন্তু এর জন্য বিপুল পরিমান জমি হুকুম দখল করতে হবে। এতে মূল্যবান জমি চাষাবাদের আওতার বাইরে চলে যাবে, হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হবে এবং তাদের পুনর্বাসনের সমস্যা সৃষ্টি হবে।

চতুর্থত: ব্রহ্মপুত্রের শুকনো মৌসুমের পানি বাংলাদেশের ভবিষ্যত উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক। এখানে যা পানি আছে তা সব চাযাবাদ যোগ্য জমির সেচের জন্য পর্যাপ্ত নয়। এছাড়া সমুদ্রের জোয়ারের সংগে আসা লোনা পানির প্রভাব প্রতিহত করার জন্য নদীতে যথেষ্ট পরিমান মিঠা পানির প্রয়োজন রয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের শুকনো মৌসুমের পানি কমে গেলে এ অঞ্চলে সে রকম অবস্থা হবে, যে রকম অবস্থা হয়েছে ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট গংগা অঞ্চলে। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে যৌথ নদী কমিশন গংগার শুকনো মৌসুমের পানি বৃদ্ধির প্রশ্নে উভয় পক্ষের মতানৈক্য সম্মিলিত

Dhaka University Institutional Repository

কমিশনের রিপোর্টে দু'সরকারের নিকট পেশ করা হয়। এ রিপোর্ট বাংলাদেশ ভারতের সংযোগ খালের প্রস্তাব সম্পূর্ন রূপে প্রত্যাখান করে[১৯]। এভাবে চারটি বৈঠক ও দু'দেশের প্রকল্প পরিদর্শনের পরে নদী কমিশন দু'পক্ষের বিপরীত মতে অটল থেকে এ ব্যাপারে আলোচনা শেষ করে।

স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক একটি আশা ব্যঞ্জক বন্ধুত্বের প্রকাশ ঘটেছিল কিন্তু তা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। এর কারন দু'দেশের মধ্যে বেশ ক'টি সমস্যা ছিল যার সমাধান সহজ ছিল না। তদুপরি ব্যবসা বানিজ্য ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে ভারত বাংলাদেশের নিকট যে সুযোগ সুবিধা আশা করেছিল তা বংলাদেশের পক্ষে পালন করা অসম্ভব ছিল। অন্য দিকে গংগার পানির ন্যায্য হিস্যার দাবি ছেড়ে দিতে অথবা ভারতের ব্রক্ষপুত্র-গংগা সংযোগ খালের প্রস্তাবে রাজি হওয়া বাংলাদেশের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। ফারাক্কা ব্যারেজের নির্মান কাজ শেষ হয়ে গেলে বাংলাদেশ বাধ্য হয় ফারাক্কায় পরীক্ষামূলক ভাবে পানি প্রত্যাহার করার ভারতীয় অজুহাতে ফারাক্কা ব্যারাজ চালু করার বিষয়ে সম্মত হতে। ভারত ১৯৭৫ সালের স্বল্প মেয়াদী চুক্তিতে কম পরিমানে পানি প্রত্যাহারে রাজি হয় কোন প্রকারে ফারাক্কা ব্যারাজ চালু করার জন্য।

১৯. আব্বাস বি,এম,এটি, "*ফারাক্কা ব্যারাজ ও বাংলাদেশ*"(ইউ.পি.এল,ঢাকা).১৯৮৮. পৃ ৪৯-৫০।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৩

প্রথম পানি বন্টন চুক্তি ও মূল্যায়ন

Dhaka University Institutional Repository

গংগার পানি বন্টনের প্রথম চুক্তি ও মূল্যায়ন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানকে নির্মম ভাবে হত্যার পর ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর নীতি পরিবর্তন করেন। এবং কোন রকম আলোচনা ব্যতীত ভারত এক তরফা ভাবে ১৯৭৬ সালের শুস্ক মৌসুমে ৪০.০০০ কিউসেক পানি প্রত্যাহার করে[১]। ফলে বর্ষা মৌসুম শেষ হওয়ার সংগে ফারাক্কায় ভারতের গংগার পানি প্রত্যাহারের প্রভাব পরিলক্ষিত হতে শুরু করে। বাংলাদেশ ভারতের কাছে ফারাক্কায় একতরফা বিপুল পরিমান পানি প্রত্যাহারের প্রতিবাদ জানায়। সেই সংগে বাংলাদেশ প্রস্তাব করে যে, ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে সাময়িক সমঝোতা মাফিক যে পরিমান পানি হুগলীতে প্রত্যাহার করা হয়েছিল, তারই উপর ভিত্তি করে ফারাক্কায় দু'দেশের মধ্যে পানি বন্টন চুক্তি করা হোক। ১৯৭৬ সালের ১৫ জানুয়ারী প্রেরিত এ প্রতিবাদের পরে ৩ ফেব্রুয়ারী ভারতের নিকট আর একটি প্রতিবাদ লিপি পাঠানো হয়। ১১ ফেব্রুয়ারী পানি বিশেষজ্ঞ বি, এম, আব্বাস এটি বাংলাদেশে নদীর পানির অবস্থার বিবরন সম্বলিত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেন। এতে উল্লেখ করা হয় যে, কিভাবে হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নিকট গংগার পানির পরিমান ও উচ্চতা কমে যাচ্ছে । পরদিন নতুন দিল্লীতে এক ভারতীয় মুখপাত্র ঘোষনা দেন যে, ভারত সরকার ফারাক্কার পানি নিয়ে আলোচনা করতে রাজী আছে, কিন্তু শুস্ক মৌসুমে সবচেয়ে ক্ষীন সময়ের পানির বিষয়ে। বাংলাদেশ জানায় যে, আলোচনা করতে হবে সম্পূর্ন শুস্ক মৌসুমের পানির জন্য। ২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ বাংলাদেশ ভারতকে জানায় যে, ফরাক্কায় অব্যাহত ভাবে পানি প্রত্যাহার না করা হলে অর্থবহ কোন আলোচনা হতে পারে না[২]।

ফারাক্কায় ভারতের বিপুল ভাবে ও এক তরফা পানি প্রত্যাহার ও তার ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ক্ষতিকর প্রভাব জন মনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবি ও ছাত্র সমাজ সহ বিভিন্ন সংস্থা একক বা সম্মিলিত ভাবে বিবৃতি, সেমিনার ও সভা সমাবেশের মাধ্যমে ভারতের পানি প্রত্যাহারের তীব্র সমালোচনা করে। বর্ষীয়ান রাজনীতিক মজলুম জন নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এ বিষয়ে মিসেস গান্ধীকে এক পত্র দিয়ে তাকে ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার বন্ধ করতে বলেন।

১. Swain Ashok. "*The Enuvironmental trap*" Report No-44, 1995,(Uppsala university, Sweden), p- 41.

২. Abbas B.M. AT. "*The Ganges waters dispute*"(U PL, Dhaka, 1982), p.p - 47, 48.

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী সে পত্রের উত্তর দেন, কিন্তু মাওলানা ভাসানী সে উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে মিসেস গান্ধীকে আর একটি চিঠি লেখেন এবং সে চিঠিতে তিনি ফারাক্কা বিষয়ে আন্দোলন করার জন্য তার সংকল্পের কথা জানিয়ে দেন। এই পরিকল্পনা আন্দোলনে রূপ নেয় ১৯৭৬ সালের ১৬ মে রাজশাহী থেকে ফারাক্কা অভিমুখে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত এক পদযাত্রায়[৩]। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। অত:পর বাংলাদেশ সরকার গংগার পানি সমস্যা সম্পর্কে ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শ্বেত পত্র প্রকাশ এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবন মরন সমস্যা সৃষ্টিতে ভারতকে এক তরফা ভাবে দায়ী করেন[৪]।

১৯৭৬ সালের পুরো শুকনো মৌসুমে জানুয়ারী থেকে মে পর্যন্ত ভারত ফারাক্কায় ফিডার ক্যানেলের পূর্ন ধারন ক্ষমতা পরিমান পানি গংগা থেকে প্রত্যাহার করে। বাংলাদেশ থেকে অনেক লেখা লেখির পর ভারত প্রথমে একটি বিশেষজ্ঞ দলকে ২৭ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত সরেজমীনে অবস্থা দেখার জন্য বাংলাদেশে পাঠায়। বংলাদেশ থেকেও অনুরূপ একটি দল ফারাক্কা ও হুগলীতে যায় ৬ মে থেকে ১১ মে পর্যন্ত। কিন্তু দু'দলের সফর আলোচনায় কোন ফল হয়নি। ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার পুরোদমে চলতে থাকে।

জুন মাসে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারক কমিটির চেয়ারম্যান জি. পার্থসারথীর নেতৃত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের সৌজন্যমূলক ভারতীয় প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে আসে। এ দল উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সংগে দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। আলোচনায় অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল ফারাক্কা সমস্যা। ভারতীয় দল জানায় যে, ফারাক্কা সম্পর্কে আরো সমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশের নতুন সামরিক সরকার রাজনৈতিক বৈধতা পাওয়ার কৌশল হিসাবে বিষয়টি জাতিসংঘে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ১৯৭৬ সালের মে মাসে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন, আগষ্ট মাসে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন কলোম্বোতে এবং ১৯৭৬ সালে ৩১ তম জাতিসংঘ অধিবেশনে উপস্থাপন করে। কিন্তু জাতিসংঘ বিষয়টি দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পরামর্শ সহ জোট নিরপেক্ষ অন্যদেশের মধ্যস্থতায় মীমাংসার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে[৫]। এর মধ্য দিয়ে

৩. Abbas B.M. AT. "*TheGanges waters dispute.*"(UPL Dhaka, 1982), p. 50.

৪. Ganges water Crisis in Bangladesh (*Govt. of the pepoles Republic of Bangladesh, 1977*).

৫. Swain Ashok, "*The Environmental Trap,*" Report No- 44, 1995(Uppsala University, Sweden), P- 42.

বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত দূর্বল হয়ে পড়ে। কারন জাতিসংঘের কাছে প্রাপ্তি-প্রত্যাশার চেয়ে খুবই কম অর্জিত হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশ শেষ আশ্রয় স্থল জাতিসংঘের ভূমিকায়-হতাশ হয়ে পড়ে[৬]।

১৯৭৭ সালের প্রথম দিকে বাংলাদেশ সরকার ভারতকে সতর্ক ও কৈফিয়ৎ বা ব্যাখ্যামূলক এক স্মারকলিপি প্রদান করে। স্মারক লিপিতে ফারাক্কা সমস্যা সমাধানে ভারত সন্তোষজনক কোন পদক্ষেপ গ্রহন না করলে দু' দেশের -এ অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হবে বলে উল্লেখ করেন[৭]।

১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় রাজনীতির পট পরিবর্তন হয়। সাধারন নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেসকে পরাজিত করে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসে এবং প্রধান মন্ত্রী হন মি: মোরারজী দেশাই। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেই পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহন করে এবং প্রতিবেশী দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহ প্রকাশ করে[৮]।

ভারতে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে গংগার পানি বন্টন প্রশ্নে একটি মীমাংসায় আসার জন্য ভারতের আগ্রহ প্রকাশ পায়। নদীর পানি নিয়ে দীর্ঘ দিনের নিস্ফল আলোচনায় বাংলাদেশের জন্য গভীর উদ্বেগ ও হতাশার কারন হয়েছিল। ১৯৭৫-৭৬ সালে ফারাক্কায় ভারতের একতরফা ও পুরো মাত্রায় গংগার পানি প্রত্যাহারে বাংলাদেশের অনেক ক্ষতি হয় এবং ভবিষ্যতে কি ঘটতে পারে তার একটা নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতে সরকার পরিবর্তনে বাংলাদেশের জন্য গংগার পানির ন্যায্য হিস্যা অর্জনে আর একবার চেষ্টা করার সুযোগ আসে।

এসময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দক্ষিণ এশিয়া সহযোগিতা সংস্থা (*SAARC*) গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। এমনি এক পরিবেশে দু'দেশের মধ্যে গংগার পানি বন্টন সম্পর্কে পাঁচ বছর মেয়াদী এক চুক্তি স্বাক্ষরের সমঝোতা হয়। এবং এ সমস্যার একটি দীর্ঘ মেয়াদী সমাধানের কথাও চিন্তা করেন।

৬. Crow Ben, "*Sharing the Ganges*,"(UPL- Dhaka, 1997) p. 113.

৭. *Ibid.*

৮। *Ibid.*

৫ নভেম্বর ১৯৭৭ সালে চুক্তিস্বাক্ষরের পর উক্ত চুক্তি অনুসারে সব চেয়ে বেশী সমস্যার দিন গুলো শুস্ক মৌসুমে অর্থাৎ ২১ থেকে ৩০ এপ্রিল ভারতকে ২০,৫০০ কিউসেক এবং বাংলাদেশকে ৩৪,৫০০ কিউসেক পানি প্রত্যাহারের সুযোগ দেয়া হয়। চুক্তি মতে ফারাক্কায় প্রবাহিত মোট ৫৫,০০০ কিউসেক পানির মধ্যে ৩৭.৫ ভাগ পানি ভারতকে দেয়া হয় এবং বলা হয় যে, প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে ৪০% ভাগ পানি দেয়া হবে[৯]।

১৯৭৭ সালের গংগার পানি বন্টন চুক্তি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কেননা চুক্তিটি সুদীর্ঘ আলোচনা ও তিক্ত অভিজ্ঞতার ফসল। এ চুক্তি সম্ভব হয়েছিল বাংলাদেশ ও ভারতের তদানীন্তন সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও দু' সরকার প্রধান জেনারেল জিয়া ও দেশাইর ঐকান্তিক ইচ্ছা ও সংকল্পের জন্য। গংগার পানি বন্টনের বিষয়ের এটি প্রথম চুক্তি[১০]। ১৯৭৭ সালের ৫ নভেম্বর ঢাকায় চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের পক্ষে রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ, খান এবং ভারতের পক্ষে সেচমন্ত্রী সুরজিত সিং বার্নালা।

৯. Swain Ashok, "*The Environmentel Trap*", Report. NO.44, 1995,(Uppsala University, Sweden), P .43.
১০. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৭ সালের চুক্তির প্রকৃতি ও বিষয় বস্তু

চুক্তির শিরোনামটি শুরু হয়েছিল এভাবে, "ফারাক্কায় গংগা নদীর পানি বন্টন এবং পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করা সম্পর্কে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি" দু'দেশের বন্ধুত্ব ও সৎ প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক উন্নয়ন জোরদার করতে বদ্ধ পরিকর হয়ে উভয় দেশের জনগনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির একই আকাঙ্খায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উভয় দেশের এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদী সমূহের পানির পারস্পরিক সমঝোতা ভিত্তিক বন্টন এবং যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের অঞ্চলের পানি সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়াসী।

১৯৭৭ সালের পানি বন্টন চুক্তিতে ভারত প্রথম বারের মত গংগা নদীকে আন্তর্জাতিক নদী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। যদিও ভারত আজ পর্যন্ত ব্যাপারটিকে দ্বি-পাক্ষিক সমাধানের বাইরে তৃতীয় কোন পক্ষের উপস্থিতি বা সমঝোতায় ঘোর বিরোধী। ১৯৭৭ সালের চুক্তিটি বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, এর গুরুত্বপূর্ন দিক গুলো হলো, অনুচ্ছেদ -১: ভারত কর্তৃক স্বীকৃত বাংলাদেশের প্রাপ্য পানি ফারাক্কায় পরিমাপ করা হবে; অনুচ্ছেদ- ২ (১) এ ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ মে সময়কে *Lean season* হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এবং এসময়ে গংগা নদীর পানি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্টনের সূত্র হল সংযোজিত তফশিলের ২নং কলামে বর্নিত পানির পরিমান, যার ভিত্তি হচ্ছে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ফারাক্কায় রেকর্ড কৃত প্রবাহের ৭৫ শতাংশ নির্ভরযোগ্যতার উপর।

অনুচ্ছেদ ২ (২) বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন এখানে বলা হয়েছে যে, সংযোজিত তফশিলের ৪নং কলামে প্রদর্শিত পরিমান পানি প্রতি ১০ দিন মেয়াদের হিসাবে ছাড়া হবে। কিন্তু যদি কোন ১০ দিন সময়ে ফারাক্কায় গংগার পানি প্রবাহ এমন পর্যায়ে হ্রাস পায় যে, তফশিলের ৪নং কলামে প্রদর্শিত বাংলাদেশের প্রাপ্য পানির পরিমান ৮০ শতাংশের নিচে নেমে যায়, সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অংশ উক্ত সময়ের ৪নং কলামে প্রদর্শিত পানির ৮০ শতাংশের কম হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

চুক্তির দ্বিতীয় অংশের অনুচ্ছেদ- ৮ এ দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থায় উভয় সরকার শুস্ক মৌসুমে গংগা নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধির দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যাটির একটি সমাধান খুঁজে বের করার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ- ৯: এ যৌথ নদী কমিশনকে গংগার পানি প্রবাহ বৃদ্ধির পর্যালোচনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এবং বলা হয় যে, "উভয় সরকার কর্তৃক গঠিত যৌথ নদী কমিশন শুস্ক মৌসুমে গংগা নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য একটি মিতব্যয়ী ও গ্রহন যোগ্য প্রকল্প নির্ধারনের উদ্দেশ্যে যে কোন সরকার কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রস্তাবিত অথবা ভবিষ্যতে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো অনুসন্ধান ও সমীক্ষা করে দেখবেন। তারা তিন বছরের মধ্যে উভয় সরকারের কাছে তাঁদের সুপারিশ পেশ করবেন"।

অনুচ্ছেদ- ১০: এ দু'সরকার এক বা একাধিক প্রকল্প বিবেচনা করবেন ও ঐক্যমতে উপনীত হবেন এবং সেই প্রকল্প বা প্রকল্প সমূহ যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে কার্যকরী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহন করবেন।

অনুচ্ছেদ-১৩: এ চুক্তি বলবৎ করার তারিখ থেকে তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর উভয় সরকার চুক্তিটি পর্যালোচনা করবেন। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বে অথবা উভয় সরকার কর্তৃক স্থিরকৃত সময়ে চুক্তিটি পুনরায় পর্যালোচনা করা হবে।

অনুচ্ছেদ-১৫: এ চুক্তির মেয়াদ পাঁচ বছর সময়ের জন্য বলবৎ থাকবে এবং পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এই চুক্তির মেয়াদ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বর্ধিত করা যাবে।

সারণী-৩.১ এ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার পানি বন্টন চুক্তির সিডিউল উপস্থাপিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৩.১

প্রতিবছর ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ফারাক্কায় পানি বন্টন, চুক্তি ১৯৭৭।

সময়কাল	ফারাক্কায় পানি প্রবাহ (১৯৪৮-৭৩পর্যন্তপর্যবেক্ষন করা তথ্যের ৭৫ শতাংশ নির্ভর যোগ্য ভিত্তিতে) কিউসেক	ফারাক্কায় ভারতের প্রাপ্য পানির পরিমাণ কিউসেক	বাংলাদেশের প্রাপ্য পানির পরিমান কিউসেক
জানুয়ারী			
১-১০	৯৮,৫০০	৪০,০০০	৫৮,৫০০
১১-২০	৮৯,৭৫০	৩৮,৫০০	৫১,২৫০
২১-৩১	৮২,৫০০	৩৫,০০০	৪৭,৫০০
ফেব্রুয়ারী			
১-১০	৭৯,২৫০	৩৩,০০০	৪৬,২৫০
১১-২০	৭৪,০০০	৩১,০০০	৪২,৫০০
২১-২৮/২৯	৭০,০০০	৩০,৭৫০	৩৯,২৫০
মার্চ			
১-১০	৬৫,২৫০	২৬,৭৫০	৩৮,৫০০
১১-২০	৬৩,৫০০	২৫,৫০০	৩৮,০০০
২১-৩১	৬১,০০০	২৫,০০০	৩৬,০০০
এপ্রিল			
১-১০	৫৯,০০০	২৪,০০০	৩৫,০০০
১১-২০	৫৫,৫০০	২০,০০০	৩৪,৭৫০
২১-৩০	৫৫,০০০	২০,০০০	৩৪,৫০০
মে			
১-১০	৫৬,৫০০	২১,৫০০	৩৫,০০০
১১-২০	৫৯,২৫০	২৫,০০০	৩৫,২০০
২১-৩১	৬৫,৫০০	২৬,৭৫০	৩৮,৭৫০

(Source: Begum Khurshida, "*Tension over the Farakka Barrage*," (UPL. Dhaka, 1987, p-182.)

Dhaka University Institutional Repository

চুক্তি স্বাক্ষরকারী দু'টি দেশ পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে সমঝোতা, সহমর্মিতা ও ত্যাগের নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে, পানি বন্টন তফশিল বিশ্লেষন করলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠে। চুক্তির উভয় পক্ষ এপ্রিলে *Leanest period* এ ৪০,০০০ কিউসেক পানি পাওয়ার দাবি করে। সে ক্ষেত্রে ভারত বাংলাদেশের চেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে। অর্থাৎ ভারত তার দাবির ৫০ ভাগ ছেড়ে দিয়ে মাত্র ২০,৫০০ কিউসেক পানি পেয়ে সন্তুষ্ট থেকেছে। পক্ষান্তরে এ সময়ে বাংলাদেশ লাভ করেছে ৩৪,৫০০ কিউসেক। এই ৩৪,৫০০ কিউসেক পানি প্রাপ্তি প্রমান করে যে, এপ্রিল মাসের *Leanest period* ছাড়া অন্য সময় গংগার পানি প্রবাহ বাংলাদেশ এলাকায় ৩৪,৫০০ কিউসেকের বেশী থাকে। যদিও বাংলাদেশ তার দাবিকৃত পানির কম পেয়েছে তবুও এটা বলা যায় যে, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রাপ্ত পানির সদ্ব্যবহার করলে তা দিয়ে তার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে। এছাড়া ১ মে থেকে ২০ মে পর্যন্ত ভারত তার পানির পরিমান পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করেছে বাংলাদেশের তুলনায়। এর কারন এসময় পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করে।

অন্যদিকে ১৯৭৫ সালের অস্থায়ী সমোঝোতার সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতের জন্য বেশ ছাড় দিয়েছে। ১৯৭৫ সালের এপ্রিল মাসের শেষ ১০ দিন বাংলাদেশ পেয়েছে ৪৪,০০০ কিউসেক অথচ ১৯৭৭ সালের চুক্তিতে সে নিয়েছে ৩৪,৫০০ কিউসেক। কাজেই দেখা যায় যে, ভারতের অংশ ১১,০০০ কিউসেক থেকে বেড়ে ২০,৫০০ কিউসেকে দাড়িয়েছে। নিম্নোক্ত সারণী- ৩.২ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের কম ও ভারতের বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সারণী-৩.২

১০ দিন	ফারাক্কার নির্ভরযোগ্য প্রবাহ-১৯৭৫এবং ১৯৭৭	ভারতের অংশ		বাংলাদেশের অংশ	
		১৯৭৫	১৯৭৭	১৯৭৫	১৯৭৭
এপ্রিল					
২১-৩০	৫৫,০০০	১১,০০০	২০,৫০০	৪৪,০০০	৩৪,৫০০
মে১-১০	৫৬,৫০০	১২,০০০	২১,৫০০	৪৪,৫০০	৩৫,০০০
১১-২০	৫৯,২৫০	১৫,০০০	২৪,০০০	৪৪,২৫০	৩৫,২৫০
২১-৩০	৬৫,৫০০	১৬,০০০	২৬,৭৫০	৪৯,৫০০	৩৮,৭৫০

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৭ সালের পানি বন্টন চুক্তিতে দেখা যায় যে, চুক্তিটি প্রকৃত অর্থে ভারতের অনুকূলে ছিল। এবং চুক্তিটি ছিল পূর্বেকার তুলনায় অসামঞ্জস্য পূর্ণ। এ বন্টনেই প্রথম বারের মত *Lean Season* এর দশ দিন ভারতের জন্য কমপক্ষে ২০,৫০০ কিউসেক পানি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। এবং *Leanest Period* এর পর ভারতের পানি প্রাপ্তির পরিমান ক্রমশ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের প্রাপ্তি কমানো হয়েছে। ১৯৭৫ সালে *Leanest Period* এ ভারত যেখানে ১১,০০০ কিউসেক পানি পেয়েছে সেখানে ১৯৭৭ সালে তা বাড়িয়ে দ্বিগুন অর্থাৎ ২০,৫০০ কিউসেক করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ যেখানে ১৯৭৫ সালে ৪৪,০০০ কিউসেক পানি পেত তা কমিয়ে ১৯৭৭ সালে ৩৪,৫০০ কিউসেক করা হয়েছে। তুলনামূলক বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ সালের চেয়ে ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশের জন্য পানির বরাদ্দ কমানো হয়েছে এবং ভারতের জন্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

দু'দেশের পানি প্রাপ্তির পরিমান বাড়ানো এবং কমানোর ব্যাপারটা সমান ভাবে হয়নি। প্রতি দশ দিনে ভারতের বৃদ্ধির পরিমানের চেয়ে বাংলাদেশের জন্য বৃদ্ধির পরিমান কম। তবে ১৯৭৭ সালের চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে এটা নিশ্চিত হলো যে, *Leanest Period* এর ৪০,০০০ কিউসেক পানি কোন মতেই আর ভারত একা প্রত্যাহার করতে পারবেনা।

যেহেতু ভারত এক তরফা ভাবে সমস্ত পানি নিজেদের প্রয়োজনে প্রত্যাহার করত সেহেতু পানি বন্টন চুক্তিতে তাদের একমত পোষন করাই ভারতের বড় ত্যাগ স্বীকারের পরিচায়ক। যদিও ভারত সবচেয়ে শুস্ক মৌসুমের ১০ দিনে বাংলাদেশের জন্য বেশি পানি বরাদ্দ দিয়েছে। তথাপিও সামগ্রিক বিচারে ৫ মাস বাংলাদেশের চেয়ে ভারতই বেশি লাভবান হয়েছে। যার প্রমান হিসাবে অনুচ্ছেদ- ৩ উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে বলা হয়েছে যে, ফারাক্কা এবং গংগার উভয়তীরে যেখানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় অবস্থিত, সেই স্থানের মধ্যবর্তী এলাকায় প্রাপ্য পানি হ্রাস করা যাবে না। তবে ভারত যুক্তিসঙ্গত কারনে সর্বাধিক ২০০ কিউসেক পানি ব্যবহার করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ষাকালে গংগার পানি প্রবাহ

১৯৭৭ সালের পানি বন্টন চুক্তি ভারতের জন্য একটি রক্ষা কবচ হিসাবে বর্ষা কালে তাকে রক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। সংযোজিত তফশিলে শুস্ক মৌসুম সম্পর্কে উল্লেখ থাকলেও বর্ষা কালীন সমস্যা সম্পর্কে কোন আলোকপাত করা হয়নি। অর্থাৎ প্রতি বছর জুন মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ষা কালে ভারত কি পরিমান পানি বাংলাদেশে ছাড়বে তা সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই। বর্ষা মৌসুমে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ই বন্যা সমস্যার মুখোমুখি হয়। এ সময় ভারত বন্যা কবলিত হলে সে অতিরিক্ত পানি বাংলাদেশে প্রত্যাহার করে এবং বাংলাদেশ সঙ্গত কারনেই প্রতি বছর বন্যা কবলিত হয়। ভারত এ ভাবে কখনই কোন নির্দিষ্ট পরিমান পানি প্রত্যাহার করেনা। এবং বর্ষা কালে অতিরিক্ত পানি ছেড়ে বন্যার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ ধ্বংসের মুখোমুখি হলেও কোন দায় দায়িত্ব বহন করেনা।

১৯৭৭ সালের পানি বন্টন চুক্তি বছরের বার মাসের সুসমন্বিত কোন ব্যবস্থা নয়। এতে শুস্ক মৌসুমের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ পাঁচ মাসের ব্যবস্থাপনা থাকলেও বছরের বাকি সাত মাস অর্থাৎ বর্ষা কালকে এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। এর ফলে বাংলাদেশই ভারতের চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এক্ষেত্রে যদি বাংলাদেশের ধারন ক্ষমতার কথা চিন্তা করে পানি প্রত্যাহার করার সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা থাকতো তাহলে বাংলাদেশ প্রতি বছর বিপুল পরিমান ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতো না।

স্বল্প মেয়াদী ব্যবস্থা পর্যবেক্ষন

১৯৭৭ সালের স্বল্প মেয়াদী চুক্তির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষনের জন্য বা গংগার পানি প্রবাহের অব্যাহত মাত্রার গ্রহন যোগ্য পরিমান নিশ্চিত করার জন্য দু'দেশের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত কমিটি দায়িত্ব পালন করবে বলে উভয় পক্ষ ঐক্যমত পোষন করেন। অনুচ্ছেদ-৪ অনুসারে এই যৌথ কমিটি ফারাক্কায় ও হার্ডিঞ্জ ব্রিজে যথোপযুক্ত পর্যবেক্ষক দল গঠন করবেন। গঠিত দল যথাক্রমে (১) ফারাক্কায় (২) ফিডার ক্যানেল (৩) ফারাক্কা বাঁধের নিচে এবং (৪) হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচে পর্যবেক্ষনের দায়িত্ব পালন করবেন। এই যৌথ কমিটি তার নিজস্ব

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ম কানুন ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারন করবেন (অনুচ্ছেদ ৫) অনুচ্ছেদ-৬ অনুসারে যৌথ কমিটি তাদের সংগৃহীত সকল তথ্য উভয় সরকারের নিকট পেশ করবেন এবং উভয় সরকারের কাছে বার্ষিক রিপোর্টও পেশ করবেন।

অনুচ্ছেদ ৭-এ যৌথ কমিটি এই ব্যবস্থাপনা কার্যকর করতে এবং ফারাক্কা বাঁধের পরিচালনায় উদ্ভূত যে কোন সমস্যা পরীক্ষা করার জন্য দায়ী থাকবেন। এ ব্যপারে কোন মত পার্থক্য বা বিরোধ যদি এই যৌথ কমিটি মীমাংসা করতে অপারগ হন, তবে সেক্ষেত্রে উভয় সরকারের মনোনীত সমসংখ্যক বাংলাদেশী ও ভারতীয় বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত প্যানেলের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করা হবে যদি তাতেও মত পার্থক্য অমীমাংসিত থেকে যায় তাহলে উভয় সরকারের নিকট পেশ করা হবে। উভয় সরকার তখন পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের জন্য জরুরী ভিত্তিতে উপযুক্ত পর্যায়ে মিলিত হবেন এবং যদি তাতেও মতৈক্য না হয়, তবে পরস্পর স্বীকৃত অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তির ব্যবস্থা করবেন।

১৯৭৭ সালের চুক্তির মেয়াদ পাঁচ বছর। এটা সত্যিকারার্থে একটি সমাধান নয় বরং এটাকে একটি অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। এ ব্যবস্থাপনায় কেবল মাত্র শুস্ক মৌসুমে পানি সমস্যার কথা ভাবা হয়েছে। বর্ষা কালীন সমস্যা সম্পর্কে ভাবা হয়নি। তবে শুস্ক মৌসুমে গংগার পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উভয় দেশ গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছে এবং দীর্ঘ মেয়াদী চিন্তার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়েছে। কাজেই চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন অথাৎ পাঁচ বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্লান তৈরী এবং সে মোতাবেক প্রকল্প গ্রহন করার কথা চিন্তা করা হয়েছে। পানি প্রবাহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দু'দেশ পরস্পর ভিন্ন মত পোষন করলে ও নির্ধারিত পাঁচ বছরের মধ্যে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহন করার চিন্তা করা হয়েছে। পানি প্রবাহ সম্পর্কিত ব্যপারটিকে 'সম্মত চুক্তি' হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। এ সম্মতি চুক্তির ক্ষেত্রেও রয়েছে অস্পষ্টতা আর তা হলো দু'দেশ পানি প্রবাহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ঐক্যমত্যে পৌছতে পারলে কোন প্রকল্প বা প্রকল্প সমুহ গ্রহন করতে পারবে কিনা অথবা প্রকল্প গৃহীত ও বাস্তবায়িত হলে পুনরায় চূড়ান্ত ভাবে পানি বন্টন চুক্তি সম্পাদন করতে হবে কিনা সে সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

এটা অনস্বীকার্য যে ১৯৭৭ সালের চুক্তিটি একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা যা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কার্যকরী থাকবে। প্রকৃত পক্ষে এর মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন কারীদের বড় মনের পরিচয় পাওয়া যায় না। কেননা বাংলাদেশের প্রস্তাব ছিল যে, যতক্ষন পর্যন্ত না দীর্ঘ মেয়াদী সমাধানে পৌঁছা না যাবে ততোক্ষন পর্যন্ত চুক্তিটি কার্যকর থাকবে[১১]। কিন্তু ভারত এ মতে সাড়া দেয়নি। ১৯৭৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর চুক্তির প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ চুক্তির মেয়াদ দীর্ঘ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। অনুরোধের জবাবে ভারত জানায় যে, বিষয়টি ইতোমধ্যে কেবিনেটে অনুমোদিত হয়েছে কাজেই অনুরোধ রাখা যাচ্ছে না। এ ভাবে বাংলাদেশের অনুরোধ প্রত্যাখাত হয়[১২]।

যদিও অনুচ্ছেদ- ১৫ তে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এই চুক্তির মেয়াদ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বর্ধিত করা যাবে বলে বলা হয়েছে। কিন্তু এটা পরিস্কার যে, পারস্পরিক আলোচনা ব্যর্থ হলে কিংবা গংগার পানি প্রবাহ বৃদ্ধি সম্পর্কে ঐক্যমতে পৌঁছা সম্ভব না হলে মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারটা হবে বাংলাদেশের জন্য ভারতের অনুজ্ঞা সূচক।

ভারত বাংলাদেশের মানুষকে বঞ্চিত করে শুস্ক মৌসুমে পদ্মা অববাহিকার বিস্তৃত অঞ্চলকে অনুর্বর করার হীন চিন্তা নিয়ে ফারাক্কার উপর বাঁধ নির্মান করেছে। ভারত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে গংগার পানি প্রবাহের কোন পানিই পায়না। কোন পানি চুক্তি মানেই ভারতের কিছু পানি প্রাপ্তি। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ত্যাগের দিকটাই বেশি। কেননা বাঁধ নির্মান করা না হলে সমস্ত পানিই বাংলাদেশ পেত। ভারতের কৃত্রিমতাই তার পানি প্রাপ্তির সুযোগ করে দিয়েছে। অথচ ভারতের অভিমত হলো যে, বাংলাদেশর পানি প্রাপ্তি তাদের 'ত্যাগের' জন্যই সম্ভব হয়েছে। অথাৎ পানি বন্টন চুক্তি ভারতের **"*ত্যাগের*"** দৃষ্টান্ত।

সত্যি কথা বলতে কি ১৯৭৭ সালের চুক্তিটি ছিল মূলত: বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরাজমান অচলাবস্থার অবসানের সাফল্য অথবা সম্পর্ক উন্নয়নের একটি প্রক্রিয়া। কিন্তু এর মধ্যদিয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থা বা পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

১১। Begum Khurshida, "*Tension over the Farakka Barrage,*" (UPL, Dhaka, 1987), P-184.

১২। *Ibid. p-184.*

Dhaka University Institutional Repository

শুষ্ক মৌসুমে গংগার পানি প্রবাহের জন্য ভারতীয় পক্ষের সাথে পাঁচ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশী উদ্যোক্তারা অত্যন্ত খুশি হয়েছিল। এ চুক্তির মাধ্যমে ভারত সরকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে, সমঝোতার ইচ্ছা থাকলে দু'দেশের মধ্যকার যে কোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ সরকার যারা ফারাক্কার পানির উপর বহুল পরিমানে নির্ভরশীল তারা চুক্তিতে ভারতের জন্য প্রয়োজনীয় পানির পরিমান না রেখে চুক্তি স্বাক্ষরে কেন্দ্রীয় সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছে। ভারতের নতুন সরকারকে বিরোধী দল ও বুদ্ধিজীবিরাও কঠোর সমালোচনা করেছে। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশের জনগন এটাকে প্রশংসা করেনি এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে যে, ***"অপেক্ষা করুন এবং দেখুন"***। দু'দেশের কেউ চুক্তিটিকে স্বাগত জানাতে না পারলেও এটা সবাই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যে, গংগার পানিবন্টন সমস্যা একটি জটিল সমস্যা এবং এর একটি দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেননা ব্যাপারটি দু'দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট[১৩]।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত গংগার পানি বন্টন চুক্তি জাতিসংঘে ও বিভিন্ন দেশে বিশেষ অভিনন্দন লাভ করে। ১৯৭৮ সালের ২ জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ভারতীয় পার্লামেন্টে যে ভাষন দেন, তাতে তিনি এই উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলের পানি উন্নয়নে দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন এবং এই অঞ্চলের সম্মিলিত যে কোন প্রচেষ্টায় সাহায্য করার জন্য তাঁর দেশের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেন। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী জেমস কালাহান ও তাঁর ভারত সফরে নতুন দিল্লীতে ১৯৭৮ সালের ৯ জানুয়ারী এক সাংবাদিক সম্মেলনে আশা প্রকাশ করেন যে, নদীর পানি উন্নয়নে ভারত, বাংলাদেশ ও নেপাল সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করবে এবং সে চেষ্টায় গ্রেট বৃটেন সাহায্য দিতে প্রস্তুত[১৪]।

গংগা চুক্তি সম্পাদনের পরে যৌথ নদী কমিশনের ১৪তম বৈঠক বসে ঢাকাতে ১৯৭৮ সালের ২০ জানুয়ারী। এ বৈঠকে ভারত ও বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন যথাক্রমে ভারতীয় সেচ মন্ত্রী মি: সুরজিত সিং বার্নালা এবং বাংলাদেশের পক্ষে মি: বি, এম আব্বাস। এবার কমিশনের সামনে প্রধান বিষয় ছিল ফারাক্কায় পানি ভাগা ভাগির তদারকি এবং চুক্তিতে বর্নিত দীর্ঘ

১৩. **Swain Ashok**, "*The Environmental Trap*", Report No-44, 1995,(Uppsala University, Sweden), P-44.
১৪. **Abbas B.M. AT**, "*The Ganges waters Dispute*",(UPL. Dhaka, 1982), P-105.

Dhaka University Institutional Repository

মেয়াদী প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখা। কমিশন ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে স্ব স্ব সরকারের প্রস্তাব বিনিময়ের সিদ্ধান্ত প্রদান করে। সে মোতাবেক বাংলাদেশের প্রতিনিধি মি: বি, এম আব্বাস ১৯৭৮ সালের ২৬ মার্চ নেপাল যান এবং বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে নেপাল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত নৌ-পরিবহনের বাংলাদেশ প্রনীত খসড়া এবং নেপালে বাংলাদেশের প্রস্তাবিত পানির রিজার্ভার নির্মান সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করে ১৯৭৮ সালের ২৫ মার্চ ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনারের মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশের এ বিষয়ে দু'টি প্রস্তাবের আদান প্রদান হয়[১৫]।

যৌথ নদী কমিশনের পরবর্তী বৈঠক হয় নতুন দিল্লীতে ৫ জুলাই ১৯৭৮ সালে। এই বৈঠকে বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত হয় বাংলাদেশের প্রস্তাবের সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় নেপালের অন্তর্ভূক্তি প্রশ্নে। বাংলাদেশের গংগার পানি বৃদ্ধির প্রস্তাব বর্ষা মৌসুমের পানি ধরে রাখার জন্য নেপালে পানির আধার নির্মান করা। এ প্রকল্পের সমীক্ষা নেপালের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতের অভিমত যে, যে তথ্য আছে তা দিয়েই বাংলাদেশের প্রস্তাব আলোচনা করা হোক, আরো তথ্যের প্রয়োজন হলে পরে তা চিঠি লিখে বা অন্য উপায়ে জানা যাবে। বাংলাদেশ জানায় যে, এটা শুধু তথ্যের ব্যাপার নয়। প্রস্তাবের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বিবেচনা করতে সরেজমিনে জরিপের প্রয়োজন হবে এবং রিজার্ভারের প্রস্তাবিত স্থান গুলিতে ড্রিলিং করে মাটির নিচের তথ্য সহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। নেপালের অংশ গ্রহন ছাড়া এ সকল কাজ করা সম্ভব নয়। এসব পরে বিবেচনার জন্য ফেলে রেখে আলোচনার মানে হবে শুধু ভারতীয় প্রস্তাবই বিবেচনা করা। বাংলাদেশ আরো জানায় যে, নেপালকে জরিপে অন্তর্ভূক্ত করার দু'টো উপায় রয়েছে। হয় নদী কমিশনে নেপালকে অন্তর্ভূক্ত করা অথবা বাংলাদেশের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য নেপাল, ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ ভাবে নেপালের কাছে এ বিষয়ে প্রস্তাব দেয়া। এ প্রশ্নের সুরাহা না করে শুধুমাত্র আলোচনা নিরর্থক। বিরতির পর বৈঠক শুরু হলে ভারত অভিমত ব্যক্ত করে যে, বাংলাদেশের প্রস্তাব চুক্তির ক্ষেত্রে একটি নতুন দিক সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের ব্যাখ্যার পরও তাঁরা চাইলেন এ বিষয়ে একটি লিখিত পত্র যাতে নেপালকে কেন অন্তর্ভূক্ত করা হবে ও কিভাবে তা করা যায়। পরে ঢাকা থেকে ভারতকে এ ব্যাপারে লিখিত ভাবে জানানো হয়। ৩১ আগষ্ট ১৯৭৮ ভারত নেপাল প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রস্তাব

১৫. *Ibid*, P-107.

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাখান করে এবং জানায় যে, যৌথ নদী কমিশন একটি দ্বি- পাক্ষিক সংস্থা এবং এর মাধ্যমেই সমাধান খুঁজতে হবে[১৬]।

১৯৭৮ সালের ৬ নভেম্বর কমিশনের ১৬ তম বৈঠক বসে ঢাকায়। বাংলাদেশ জানায় যে, ৩১ আগষ্টের চিঠিতে বর্নিত নেপালের বিষয়ে ভারতীয় যুক্তি যথাযথ নয়। এবং গংগা চুক্তি স্বাক্ষরের সঙ্গে দু'সরকারের মধ্যে চিঠি বিনিময় করা হয়। সে চিঠিতে ভারত স্বীকার করে যে, নেপালে ড্যাম নির্মান সম্মন্ধে বাংলাদেশের প্রস্তাব বিবেচনা করতে ভারত আপত্তি করবে না। গংগার পানি আলোচনা দ্বি-পাক্ষিক ঐ যুক্তি দেখিয়ে যা সে করেছিল ১৯৭৪-৭৫ সালে। চুক্তির সঙ্গে এ চিঠি দু'টি আদান প্রদান করার দরকার হয়েছিল যাতে ভারত নেপালের ব্যাপারে আবার এরকম আপত্তি করতে না পারে। বাংলাদেশ মনে করে যে অনুসন্ধানে নেপালের সহযোগিতার প্রশ্নে ভারতের আপত্তির কোন সঙ্গত কারন নেই। কারন বাংলাদেশের প্রস্তাবটাই হচ্ছে নেপালে রিজার্ভারার করা। সেখানে নেপালের সহযোগিতা ছাড়া এ প্রস্তাবের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা যায় না। বাংলাদেশ প্রস্তাব করে যে, নেপালের সাথে এ নিয়ে কথা বলার জন্য দু'দেশের প্রতিনিধি দলের নেতারা নেপালে যেতে পারেন। কিন্তু ভারত তাতেও রাজী না হওয়ায় কোন ঐক্যমত্য ছাড়াই বৈঠক শেষ হয়[১৭]।

১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতের মিড-টার্ম নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পরাজিত করে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী পূনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসেন। এর পরের যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকগুলোতে ১৮ থেকে ২১ অর্থাৎ চারটি বৈঠকেই ভারতীয় মনোভাবের কাঠিন্য পরিলক্ষিত হয় এবং দু'দেশের মধ্যে কোন বিষয়ে মতৈক্য না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এসব বৈঠকের সম্মত কার্যবিবরনী ও প্রনয়ন সম্ভব হয়নি[১৮]। কেননা এ সময় কংগ্রেস পার্টি পশ্চিম বঙ্গের চাপে দিশেহারা হয়ে পড়ে। সরকার পরিবর্তনে পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা ১৯৭৭ সালের চুক্তি প্রত্যাহার করার জন্য মিসেস গান্ধীর উপর চাপ দিয়ে বলে যে, ঐ চুক্তিতে পশ্চিম বঙ্গের স্বার্থকে উপেক্ষা করা হয়েছে[১৯]।

১৬. **Abbas B.M. AT**, "*The Ganges Waters Dispute*",(U P L- Dhaka, 1982), P,P-107, 109.
১৭. *I bid, P- 111.*
১৮. *I bid, P. P- 111, 112.*
১৯. **Swain Ashok**, "*The Environmental Trap*", Report- 44, 1995,(Uppsala University, Sweden), P-44

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮০ সালের নভেম্বর ও ১৯৮১ সালের এপ্রিলে ১৯৭৭ সালের চুক্তি মোতাবেক, চুক্তি সম্পাদনের তিন বছর পরে দু'দেশের মন্ত্রীরা চুক্তিটির কার্যকারিতা সম্মন্ধে পর্যলোচনা করেন। এই দু'বৈঠকে ও কোন সমঝোতা না হওয়াতে মন্ত্রীরা বিষয়টি উচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্তের জন্য সুপারিশ করেন।

অত:পর ১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি পদের কার্যভার গ্রহন করেন। ফলে ১৯৭৭ সালের দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি সম্পর্কে আর কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি এবং গংগার পানি বৃদ্ধির প্রশ্নে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অচলাবস্থা বিরাজমান থাকে[২০]।

দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা বার বার ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাদেশের জনগন স্বাভাবিক ভাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠে। এবং সাধারণ জনগন এ বিদ্বেষ প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠনও রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অংগন উত্তপ্ত করে তোলে। এবং ক্ষমতাসীন সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে।

২০. Abbas B.M. AT, " *The Ganges waters Dispute*",(U P L- Dhaka, yy1982), P-112.

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৪

সমঝোতা স্মারক ও মূল্যায়ন

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বাংলাদেশে সামরিক শাসন জারী করে জেনারেল এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব ভার গ্রহন করেন। ১৯৭৭ সালের গংগা পানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হয় ১৯৮২ সালের ৪ নভেম্বর। এই চুক্তি সম্পাদনের সময় মিসেস গান্ধী ভারতের বিরোধী দলের নেত্রী হিসাবে চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি ১৯৮০ সালে প্রধান মন্ত্রীর পদে ফিরে আসেন। ১৯৭৭ সালের গংগা চুক্তি নবায়ন না করে ১৯৮২ সালের ৭ অক্টোবর নতুন দিল্লীতে দু'সরকারের মধ্যে একটি "সমঝোতা স্মারক পত্র" স্বাক্ষরিত হয়। এতে ১৮ মাসের জন্য ফারাক্কায় দু'দেশের মধ্যে গংগার পানি বন্টনের ও পানি বৃদ্ধির সমীক্ষা অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ স্মারক পত্রের ভূমিকায় দু'নেতা স্বীকার করেন যে, ১৯৭৭ সালের গংগা চুক্তি একটি স্থায়ী ও সন্তোষ জনক সমাধানের ব্যাপারে উপযুক্ত প্রমানিত হয়নি এবং ফারাক্কায় অপর্যাপ্ত পানি প্রবাহের কারনে দু'পক্ষকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এ স্বীকৃতি বাংলাদেশের দূর্বল অবস্থানের পরিচায়ক। কেননা এটা লক্ষনীয় যে, সমস্যার সৃষ্টি ভারতের একতরফা গংগার পানি প্রত্যাহারের ফলে অথচ বাংলাদেশকে তার দায় ভার বহন করতে হবে।

এ স্মারক পত্রে কয়েকটি ১০ দিন মেয়াদে হিস্যার পরিমান সামান্য পরিবর্তন ছাড়া ১৯৭৭ সালের দু'দেশের মধ্যে পানি বন্টন মোটামুটি বহাল থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য পানির হিস্যার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে একটি গুরুতর পরিবর্তন করা হয়। ১৯৭৭ সালের চুক্তিতে ফারাক্কায় পানি অস্বাভাবিক মাত্রায় কমে গেলে বাংলাদেশের প্রাপ্য ভাগের শতকরা ৮০ ভাগ প্রদান নিশ্চিত করে যে, গ্যারান্টি ক্লজ অন্তর্ভূক্ত ছিল সে গ্যারান্টি ক্লজ ১৯৮২ সালের স্মারক পত্র থেকে বাদ দেয়া হয়। এর ফলে পানি বন্টনের শর্তাবলীতে একটি দুর্ভাগ্য জনক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে এবং ফারাক্কার উজানে ভারতের গংগার পানি যে কোন পরিমানে বা সবটাই প্রত্যাহার করার পথে আর কোন বাধা থাকে না। ১৯৭৭ সালের গংগা চুক্তি সম্পাদনের সময় অনেক প্রচেষ্টার ফলে এ গ্যারান্টি ক্লজ অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। এ গ্যারান্টি ক্লজ বাদ পড়াতে ভারত বাংলাদেশের জন্য নূন্যতম গংগার পানি দেয়ার চুক্তি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করে এবং বাংলাদেশ কার্যত: গংগার পানির উপর নিজের অধিকার হারায়[১]।

১. **Abbas B.M. AT**, "*The Ganges Waters Dispute*,"(U.P.L, Dhaka-1987), P.P- 116,117.

Dhaka University Institutional Repository

এর প্রমান দেখা যায় পরবর্তী ১৯৮৩ সালের শুস্ক মৌসুমেই। সে বছর ৫ এপ্রিল ফারাক্কায় গংগার প্রবাহ সর্বকালের নিম্নে নেমে আসে, প্রত্যাশিত ৫৯,০০০ হাজার কিউসেকের স্থলে মাত্র ৩৬,০০০ হাজার কিউসেকে। বাংলাদেশ পায় এ দিনের নির্ধারিত হিস্যা ৩৫,০০০ হাজার কিউসেক এর বদলে মাত্র ২৪,৪২৫ কিউসেক পানি। ১৯৮২ সালের সমঝোতা স্মারকে ১৯৭৭ সালের চুক্তিতে নেপাল সম্পর্কিত যে দু'টি চিঠি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সে দু'টিও সমঝোতা স্মারক থেকে বাদ দেয়া হয়।

১৯৮০ সালে মিসেস গান্ধী পূনরায় ক্ষমতায় আসার পর যৌথ নদী কমিশনে পানি আলোচনায় ভারতের মনোভাব আরও কঠিন হয়। এবং বাংলাদেশ সরকারের সব রকম সহযোগিতার মনোভাব দেখানো সত্ত্বেও দু'দেশের মধ্যে আলোচনায় কোন অগ্রগতি হয়নি।

১৯৮২ সালের স্বাক্ষরিত গংগার পানি বন্টনের সমঝোতা স্মারক পত্রের মেয়াদ ৩১মে ১৯৮৪ সালে শেষ হয়, গংগার পানি বৃদ্ধির প্রশ্নে কোন প্রকার মতৈক্য ছাড়াই। বাংলাদেশের পুন: পুন: অনুরোধ সত্ত্বেও ভারত ১৯৮২ সালের সমঝোতা স্মারক নবায়ন বা মেয়াদ বাড়াতে রাজি হয়নি। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর মিসেস গান্ধীর মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসেন তার পুত্র মি: রাজীব গান্ধী। ১৯৮৫ সালের পুরো শুস্ক মৌসুমে ফারাক্কায় ভারত বাংলাদেশের জন্য ইচ্ছা মত পানি ছাড়ে। ভারত- বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ২৭তম বৈঠক হয় ১৯৮৪ সালের ১৪-১৬ ডিসেম্বর নতুন দিল্লীতে এবং ২৮তম বৈঠক হয় ১৯৮৫ সালের ২-৪ জুন ঢাকাতে। কিন্তু দু'পক্ষের আলাপ আলোচনায় কোন মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে বৈঠকের কোন কার্য বিবরনীও প্রনয়ন করা সম্ভব হয়নি।

১৯৮৫ সালের ১৮ অক্টোবর বাহামার রাজধানী নাসাউতে গংগা ও অন্যান্য নদীর পানি নিয়ে দু'দেশের সরকার প্রধান বাংলাদেশের জেনারেল এরশাদ ও ভারতের মি: রাজীব গান্ধীর মধ্যে আলোচনা হয়। তাঁরা এ সময় কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের সম্মেলনে অংশ নিতে বাহামার রাজধানীতে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা স্থির করেন যে, ১৯৮২ সালের সমঝোতা স্মারক অনুসারে ফারাক্কায় গংগার পানি বন্টন ব্যবস্থা পরবর্তী তিন

Dhaka University Institutional Repository

বছরের জন্য বহাল থাকবে এবং অভিন্ন নদীর পানি বন্টন ও গংগার পানি বৃদ্ধির বিষয়ে এক যুক্ত সমীক্ষার পর এক বছরের মধ্যে তাঁরা আবার এক শীর্ষ বৈঠকে এ সব বিষয়ের নিস্পত্তি করবেন। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৯৮৫ সালের ১৮ নভেম্বর থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত দু'দেশের পানি মন্ত্রীরা নতুন দিল্লীতে গংগার পানি বন্টনের দ্বিতীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন।

এ সমঝোতা অনুসারে পানি সমীক্ষার উদ্দেশ্যে দু'সরকারের পানি সম্পদ সচিবদের নেতৃত্বে প্রত্যেক দেশ থেকে তিন জন সদস্য নিয়ে একটি যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটিকে ১২ মাস সময় দেয়া হয় এক যুক্ত সমীক্ষা করার জন্য, যার উদ্দেশ্য

(ক) গংগার পানি বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প বা প্রকল্প সমূহ প্রনয়ন এবং

(খ) দু'দেশের মধ্যে পানি সম্পদ বন্টনের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা চিহ্নিত করা।

ভারত- বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রথম বৈঠক বসে ঢাকায় ২১ নভেম্বর ১৯৮৫ সালে। এ বৈঠকে কমিটির কার্যক্রম সম্মন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

স্বল্প মেয়াদী ব্যবস্থাপনা

সমঝোতা স্মারক (১৯৮৬-১৯৮৮) এর অনুচ্ছেদ- ৫ অনুসারে দু'দেশ পরবর্তী তিন বছর শুস্ক মৌসুমে নিম্নোক্ত সারণী- ৪.১ অনুযায়ী পানি পাবে। সারণীতে ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ মে পর্যন্ত প্রতিবছর শুস্ক মৌসুম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পানি বন্টন তফশিল মোতাবেক সারণীর দ্বিতীয় কলামে গংগায় নির্ভরযোগ্য পানির প্রবাহ, তৃতীয় কলামে ভারত কর্তৃক প্রত্যাহার এবং চতুর্থ কলামে বাংলাদেশের জন্য প্রত্যাহার কৃত পানির পরিমান নির্দেশিত।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ৪.১

১ জানুয়ারী থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ফারাক্কায় পানি বন্টন।

মেয়াদ	ফারাক্কায় প্রবাহ কিউসেক	ফারাক্কা থেকে ভারত কর্তৃক প্রত্যাহার কিউসেক	বাংলাদেশের জন্য ছাড়া হবে কিউসেক
জানুয়ারী			
১-১০	৯৮,৫০০	৪০,০০০	৫৮,৫০০
১১-২০	৮৯,৭৫০	৩৮,০০০	৫১,৭৫০
২১-৩১	৮২,৫০০	৩৫,৫০০	৪৭,০০০
ফেব্রুয়ারী			
১-১০	৭৯,২৫০	৩৩,০০০	৪৬,২৫০
১১-২০	৭৪,০০০	৩১,২৫০	৪২,৭৫০
২১-২৮/২৯	৭০,০০০	৩১,০০০	৩৯,০০০
মার্চ			
১-১০	৬৫,২৫০	২৬,৫০০	৩৮,৭৫০
১১-২০	৬৩,৫০০	২৫,৫০০	৩৮,০০০
২১-৩১	৬১,০০০	২৫,২৫০	৩৫,৭৫০
এপ্রিল			
১-১০	৫৯,০০০	২৪,০০০	৩৫,০০০
১১-২০	৫৫,৫০০	২০,৫০০	৩৪,৭৫০
২১-৩০	৫৫,০০০	২০,৫০০	৩৪,৫০০
মে			
১-১০	৫৬,৫০০	২১,৫০০	৩৫,০০০
১১-২০	৫৯,২৫০	২৪,২৫০	৩৫,০০০
২১-৩১	৬৫,৫০০	২৬,৫০০	৩৯,০০০

উপরোক্ত সারণীর দুই নং কলামে ফারাক্কায় নির্ভরযোগ্য পানির প্রবাহ দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে সমঝোতা স্মারকে বলা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে যে, যদি কোন ১০ দিন সময় কালের মধ্যে ফারাক্কায় পানির প্রকৃত প্রবাহ দ্বিতীয় কলামে প্রদর্শিত পরিমানের চেয়ে কম বা বেশি হয় তবে তা সে সময়ের জন্য প্রযোজ্য অনুপাত অনুযায়ী বন্টিত হবে। অনুচ্ছেদ- ৫.১ অনুসারে মতৈক্য হয়েছে যে, পরবর্তী শুস্ক মৌসুমের যে কোন একটিতে যদি পানির প্রবাহ অস্বাভাবিক ভাবে কম মাত্রায় হয় তাহলে উভয় সরকার তাৎক্ষনিক ভাবে আলোচনায় মিলিত হবেন এবং উভয়ের যে কোন দেশের ক্ষেত্রে ক্ষতির বোঝা যতদূর সম্ভব কিভাবে কমিয়ে আনা যায় উহা ঠিক করবেন।

পানি বন্টনের ক্ষেত্রে এ ধরনের সম্ভাব্য বক্তব্য ও সমঝোতা বিশেষ অনিশ্চয়তার চিহ্ন বহন করে এবং নূন্যতম পানি প্রাপ্তির প্রত্যাশাটুকুও হতাশায় ভরে দেয়। ১৯৭৭ সালের চুক্তিতে যেখানে গ্যারান্টি ক্লজ ছিল সমঝোতা স্মারকে সেখানে অশুভ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে নানা অজুহাতে ভারত নিজস্ব স্বার্থে পানি প্রত্যাহারের কৌশল অবলম্বন করেছে। কেননা বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষ বিশেষ আলোচনার মাধ্যমে বিশেষ বা ব্যতিক্রমধর্মী সমস্যার সমাধান করে থাকে। ঐতিহাসিক যে সত্য ফারাক্কার পানি প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে রয়েছে সেক্ষেত্রে ভারতের বিশেষ অবস্থার কথা বলা সন্ধেহ জনক।

১৯৮৬-৮৮ সালে বিশেষ অবস্থার মোকাবেলায় দু'সরকার নিম্ন প্রবাহের ক্ষেত্রে সম্মত স্বীকৃতি প্রদান করে যে, গংগায় নির্ভরযোগ্য প্রবাহ যদি ৭৫ ভাগ অথবা তাঁর উপরে থাকে তাহলে বাংলাদেশ তা অনুপাত অনুসারে পানি পাবে। এবং কোন ১০ দিনে যদি প্রবাহ ৭৫ ভাগের নিচে নেমে যায় তাহলে বাংলাদেশ প্রকৃত প্রবাহের অনুপাত অনুসারে পাবে। এখানে দু'দেশ সংকট মোকাবিলায় সমান অংশীদারীত্বের স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

১৯৮৬ সালের ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারী যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে ৯ টি নদীর উপাত্ত আদান প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিটির তৃতীয় বৈঠক বসে ঢাকাতে ২-৩ জুলাই, এ বৈঠকে তথ্য আদান প্রদান ও এ সম্মন্ধে আলোচিত হয়।

১৯৮৬ সালের জুলাই মাসের শেষ দিকে ভারত ও বাংলাদেশ পৃথক ভাবে কিন্তু একই রকম চিঠিতে গংগার পানি বন্টন ও প্রবাহ বৃদ্ধির প্রশ্নে নেপালের কাছ থেকে তথ্যাদি ও সম্ভাব্য প্রকল্প সম্মন্ধে আলোচনার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য দু'দেশের প্রতিনিধি দলের নেপালে যুক্ত সফরে প্রস্তাব দিয়ে নেপালের সহযোগিতা চাওয়া হয়। এর ইতিবাচক উত্তরে নেপাল ভারত ও বাংলাদেশের যুক্ত উদ্যোগকে স্বাগত: জানিয়ে নেপালের সহযোগিতার আশ্বাস দেয়।

যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির চতুর্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালের ৪-৫ আগষ্ট নতুন দিল্লীতে। নির্বাচিত ৯ টি নদীর উপাত্ত ও দু'দেশের পানির চাহিদা ছাড়াও গংগায় পানি বৃদ্ধির প্রশ্নটি আলোচনায় স্থান পায়। এ বিষয়ে ভারত বিস্ময়কর ভাবে ব্রহ্মপুত্র - গংগা সংযোগ খাল ছাড়াও আরও দু'টি প্রস্তাব উথাপন করে বিবেচনার জন্য, সম্পুর্ন ভাবে যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্রের পানি সম্পর্কিত ভারতের তিনটি প্রস্তাব হলোঃ-

(ক) আসামের যোগীগোপায় ব্যারাজ সহ ব্রহ্মপুত্র থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দিয়ে ফারাক্কা পর্যন্ত সংযোগ খাল।

(খ) বাংলাদেশে ব্যারাজ সহ সম্পুর্ন ভাবে বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র ও গংগা সংযোজন কারী এক খাল।

(গ) ব্রহ্মপুত্রের পানি দিয়ে গংগা অন্তর্গত বাংলাদেশের আংশিক এলাকার পানির চাহিদা মেটানো- ব্রহ্মপুত্র ও গংগা সংযোগকারী কোন খাল ছাড়াই।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্রহ্মপুত্রের পানি ব্যবহারের ভারতের অতিরিক্ত দু'টি প্রস্তাব দেয়ার উদ্দেশ্য মূলত: বাংলাদেশকে নেপালে পানির আধার নির্মানের প্রস্তাব থেকে বিরত রাখার এক প্রচেষ্টা।

ফারাক্কায় হুগলী নদীতে পানি প্রত্যাহারের ফলে গংগায় পানি প্রবাহে ঘাটতি মেটানোর জন্য একটি কি দু'টি পানির আধার নির্মানই যথেষ্ট। প্রকৃত পক্ষে গংগা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কোন অসম্ভব কাজ নয়। এ জন্য যেটা আবশ্যক তা হল এ অঞ্চলের সরকারদের বিশেষ করে ভারতের দৃঢ় সংকল্প, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সহযোগিতার মানসিকতা।

১৯৮৫ সালের সমঝোতা স্মারক মূল্যায়নঃ

পানি বন্টন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে দু'দেশের পারস্পরিক ইচ্ছার কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, সবচেয়ে শুস্ক মৌসুমে বাংলাদেশের তুলনায় ভারত বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে। আবার সামগ্রিক

Dhaka University Institutional Repository

বিচারে অর্থাৎ শুষ্ক মৌসুমে পাঁচ মাসের হিসেবে ভারত বাংলাদেশের চেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। কেননা দু'দেশের পানি বৃদ্ধি ও হ্রাস যথাক্রমে সমান নয়। বাংলাদেশের পানি বৃদ্ধির হার ভারতের তুলনায় কম, প্রতি ১০ দিন হিসেবে।

গংগার পানি বন্টন সমঝোতা স্মারক পরোক্ষ ভাবে বর্ষা কালে ভারতের স্বার্থ রক্ষা করেছে প্রচুর পরিমানে। পানি বন্টন সমঝোতা হয়েছে কেবল মাত্র শুষ্ক মৌসুমের পাঁচ মাস, বাকি সাত মাস সম্পর্কে কোন চিন্তা করা হয়নি। অর্থাৎ জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় সম্পূর্ন ভারতের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বর্ষাকালে বাংলাদেশ- ভারত উভয়েই বন্যা কবলিত হয়। বিশেষ করে ভারত কর্তৃক ফারাক্কা থেকে প্রত্যাহার কৃত পানি বাংলাদেশে প্রবেশ করে বাংলাদেশকে বন্যা কবলিত করে বিপুল যান ও মালের ক্ষতি সাধন করে। পানি বন্টন সমঝোতায় সারা বৎসরের সমস্যার কথা চিন্তা করা হয়নি। যেহেতু বাংলাদেশ ভাটির দেশ সেহেতু বর্ষাকালের অতিরিক্ত পানির বোঝা বা যন্ত্রনা বাংলাদেশকেই বইতে হয়। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রাপ্তিতে যে উপকার হয় তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হয় বর্ষা কালে অতিরিক্ত পানি প্রবেশের ফলে বন্যায়। বার মাসের লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের চেয়ে ভারত বেশি লাভবান। অর্থাৎ শুষ্ক মৌসুমেও লাভবান ও বর্ষা মৌসুমেও লাভবান।

ফারাক্কায় গংগা ও শাখা নদী সমূহের পানি প্রবাহ শুষ্ক মৌসুমে বৃদ্ধি করার যৌথ সমীক্ষার কথা বলা হয়েছে এবং বার মাসের মধ্যে দায়িত্ব পালন শেষে পদক্ষেপ গ্রহন করতে বলা হয়েছে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে সময় সীমা বৃদ্ধির কোন কথা বলা হয়নি। কেননা অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, নির্ধারিত সময়ে এরকম গুরুত্ব পূর্ন কাজ সাধারনত সমাপ্ত করা যায় না। এ ছাড়া সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ ৩১মে ১৯৮৮ শেষ এর মধ্যে জে, সি, ই, তার কর্ম সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ বাড়ানো হবে কিনা অথবা নতুন কোন অন্তবর্তী কালীন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে কিনা সে সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা ১৯৮৫ সালের সমঝোতা স্মারকে নেই। নির্দিষ্ট সময় মেয়াদ শেষে ভারত এক তরফা ভাবে অতীতের ন্যায় পানি প্রত্যাহারের ইচ্ছার ভবিষ্যত সম্পর্কে চুপ থেকেছে।

Dhaka University Institutional Repository

"নাই মার চেয়ে অন্ধ মা ভাল" সে অর্থে কোন চুক্তি না থাকার চেয়ে সল্পমেয়াদী ব্যবস্থা উত্তম। অথবা যতদিন পর্যন্ত না দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি সম্পাদিত হয় ততোদিন স্বল্প মেয়াদী ব্যবস্থা থাকা ভাল। ১৯৭৭ ও ১৯৮২ সালের ব্যবস্থাপনায় স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী সমাধানের প্রক্রিয়া রাখা হয়েছিল কিন্তু স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থাপনা কার্যকরী করার প্রচেষ্টা থাকলেও দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি বা নূন্যতম পরামর্শ ছাড়াই সমাপ্ত হয়েছে।

১৯৮৫ সালের সমঝোতা স্মারকে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এটিও একটি অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা, পূর্ববর্তী ব্যবস্থার মত এখানেও স্বল্প মেয়াদী ব্যবস্থা কার্যকরী হলেও দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যার সমাধানে কোন অগ্রগতি নেই। অর্থাৎ গংগায় শুস্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ বৃদ্ধির ব্যাপারে কোন ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং দীর্ঘ মেয়াদী কোন প্রকল্প বা প্রকল্প সমূহ সুনির্দিষ্ট ভাবে গৃহীত হয়নি। ১৯৭৭ ও ১৯৮২ সালের চুক্তির মত ১৯৮৫ সালের সমঝোতা স্মারকও ব্যর্থ হয়েছে।

তবে এ কথা সত্য যে, ১৯৮৫ সালের সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ বৃদ্ধি ভারত- বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নের বাতাস পরিবর্তন করেছে[২]। গংগার পানি উন্নয়নের সিকি শতাব্দী অভিজ্ঞ একজন পর্যবেক্ষক বলেন যে, ১৯৮৫ সালের সমঝোতা স্মারক প্রথম সার্ক সম্মেলনের পূর্বে দু'দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের বিশেষ প্রয়োজনে সম্পাদিত হয়েছে[৩]। যাই হোক এ সমঝোতা ১৯৮২ সালের সমঝোতা স্মারক থেকে উল্লেখ যোগ্য কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ছাড়াই[৪]।

উপরোক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, নদীর পানি বন্টন ও গংগার পানি উন্নয়নে নেপালকে সংযুক্ত করার বিষয়ে ভারতের আগ্রহের অভাব তার কূটনৈতিক চালেরই অংশ। বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্রের পানি গংগায় প্রত্যাহারের ভারতীয় পরিকল্পনার পক্ষে চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখার জন্য। অথচ এ চাপ প্রয়োগ সম্পূর্ণ ভাবে অবৈধ এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালায় অববাহিকার পানি স্থানান্তর সম্পর্কিত নীতিমালার পরিপন্থি।

২. *Bangladesh Times*, Dhaka, 23 November, 1985, P-1.
৩. **Islam Rafiqul**, "*The Ganges Water Dispute*",(UPL, Dhaka, 1987), P-187.
৪. *The new Nation*, Dhaka, 17 January, 1986, P- 1.

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়াও শুষ্ক মৌসুমে ব্রহ্মপুত্র নদীতে যে পরিমান পানি আসে তা বাংলাদেশের প্রয়োজনের জন্যই যথেষ্ট নয়। পক্ষান্তরে গংগায় সারা বছর যে পানি আসে তা দিয়ে অববাহিকার দেশগুলো তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে। এতদসত্ত্বেও ভারতের নমনীয় নীতির ক্ষেত্রে প্রচুর অনিচ্ছা পরিলক্ষিত হয় যা বাংলাদেশের মানুষের জন্য অত্যন্ত দু:খজনক।

দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যার সমাধানঃ-
শুষ্ক মৌসুমে গংগার পানি প্রবাহ বৃদ্ধি সংক্রান্ত
বাংলাদেশ ও ভারতের পারস্পরিক প্রস্তাব।

গংগার পানি প্রবাহ সম্পর্কে মূল বিতর্কের বিষয় হল জানুয়ারী- মে পর্যন্ত শুষ্ক মৌসুমের পাঁচ মাস গংগায় পর্যাপ্ত পানি থাকে এবং ভারত তার নিজস্ব প্রয়োজনে বাংলাদেশকে পানি না দিয়ে প্রত্যাহার করে নিয়ে যায়। যা বাংলাদেশের জন্য জীবন মরন সমস্যা। শুষ্ক মৌসুমে গংগায় নুন্যতম গড় প্রবাহ থাকে ৫৫,০০০ হাজার কিউসেক। উক্ত প্রবাহ থেকে ভারতের দাবি ৪০,০০০ হাজার কিউসেক এবং বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন সবটুকু পানি। এরূপ এক সমস্যার মুখোমুখি হয়ে ১৯৭৭ সালে দু'দেশ একমত হন যে, যেহেতু দু'দেশের প্রয়োজনীয় পরিমান পানি শুষ্ক মৌসুমে গংগায় থাকে না। সেহেতু শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিভাবে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে এ প্রবাহ বাড়ানো যায় তা নির্নয়ে ও সুপারিশের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয় যৌথ নদী কমিশনকে। যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকে বাংলাদেশ - ভারত ও নেপালে অবস্থিত গংগা নদীর বিভিন্ন উপ- নদীতে পানির সংরক্ষনাগার নির্মানের মাধ্যমে বর্ষার পানি সংরক্ষন করে শুষ্ক মৌসুমে গংগা নদীর পানি বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দেয়। পক্ষান্তরে ভারতের প্রস্তাব ছিল ব্রহ্মপুত্রের পানি ফারাক্কার উজানে গংগায় প্রত্যাহার করে গংগা নদীর পানি বৃদ্ধি করা এবং এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে এক বিরাট খাল খনন করে দু'নদীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার। ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি সংক্রান্ত পরস্পর ভিন্ন দু'টি প্রস্তাব নিয়ে দু'দেশ এগিয়ে আসে[৫]।

৫ **Swain Ashok**, "*The Environmental Trap*", Report No-44, 1995,(Uppsala University, Sweden), P- 67.

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের প্রস্তাব

(ক) একটি বাঁধঃ- ভারতের মতে শুস্ক মৌসুমে গংগায় পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার পানি ফারাক্কার উজানে গংগায় প্রত্যাহার করতে হবে। ভারতের প্রস্তাব হল একটা সংযোগ খাল কেটে ব্রহ্মপুত্রের পানি গংগায় প্রবাহিত করা। আসামের যোগীগোপায় ব্রহ্মপুত্রের উপর একটি ব্যারাজ নির্মান করে ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রত্যাহার করে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ফারাক্কার উজানে গংগাতে নিয়ে আসা হবে। এই ব্যারাজের দৈর্ঘ্য হবে দেড় মাইল লম্বা এবং এটি ফারাক্কা বাঁধের চেয়ে খানিকটা বড় হবে। তবে এর নির্মান শৈলী হবে ফারাক্কা বাঁধের মত। ভারতীয় প্রকৌশলীরা এজন্য স্থান নির্ধারন করেছেন যোগীগোপায়। কারন এ স্থানে নদীটি সরু এবং এখান থেকে দু'দেশ সমান লাভবান হবে। তবে প্রকৌশলীরা বাংলাদেশের জন্য সুবিধাজনক স্থান বিবেচনা করেননি[৬]।

(খ) একটি খালঃ- প্রস্তাবিত সংযোগ খাল হবে ২০০ মাইল লম্বা যার তিন ভাগের এক ভাগ পড়বে বাংলাদেশে। এই খালের গভীরতা হবে ৩০ ফুট, প্রস্থ হবে ৯০০ ফুট, প্রস্তাব অনুসারে এ খাল দিয়ে ব্রহ্মপুত্র থেকে এক লক্ষ কিউসেক পানি প্রবাহিত করা হবে গংগায় ফারাক্কার উজানে। ভারতীয় নির্ধারকদের মতে, এ খাল বাংলাদেশের ও ভারতের যথাক্রমে ২০,০০০ একর ও ৪৪,৯৫০ একর জমি প্রয়োজন হবে। এবং এ খালের তিন এর দুই অংশ পড়বে ভারতের ভূ-খন্ডে[৭]।

(গ) দিহাং সুবর্নসিড়ি ও তিপাইমুখ ড্যামঃ- ভারত তার প্রস্তাবে তৃতীয় পর্যায়ে ব্রহ্মপুত্র নদীতে দু'টি উচ্চ বাঁধ বা ড্যাম এবং বরাক নদীতে আর একটি ড্যাম নির্মানের কাজ অন্তর্ভূক্ত করে। আসামের ২৫ মাইল উত্তরে দিহাং নদীর উপর বাঁধ নির্মানের মাধ্যমে পানির সংরক্ষনাগার তৈরী করা হবে। এর পানি সংরক্ষন ক্ষমতা হবে ২৬.৫ মিলিয়ন একর ফুট। এটাই হবে ভারতের সবচেয়ে বড় সংরক্ষনাগার এবং এটা আমেরিকার সংরক্ষনাগারের সমান ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন হবে। ভারতের মতে শুস্ক মৌসুমে এ সংরক্ষনাগার ব্রহ্মপুত্রে ৬০,০০০ থেকে ১,২০,০০০ কিউসেক পানি সরবরাহ করতে পারবে এবং এ ড্যাম ৭,৫০০ মেগাওয়াট জল বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে[৮]।

৬. Crow Ben, "*Sharing The Ganges*", (UPL, Dhaka, 1995), P-166.
৭. *Ibid*, P- 166.
৮. *Ibid*, P- 167.

Dhaka University Institutional Repository

ভারত দ্বিতীয় বাঁধ নির্মানের প্রস্তাব করে সুবর্নসিড়ি নদীর উপর। এ বাঁধ ব্রক্ষ্মপুত্রে শুস্ক মৌসুমে ২৫,০০০ কিউসেক পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করবে এবং ১,৮০০ মেগাওয়াট জল বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে।

উপরোক্ত দু'টো ড্যাম নির্মানের উপকারিতা সম্পর্কে ভারতের অভিমত হল, প্রস্তাবিত সংরক্ষনাগার দু'টি ব্রক্ষ্মপুত্র নদীর বন্যা প্লাবন হ্রাস করতে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখবে। বর্ষা মৌসুমে বন্যার প্লাবন সর্বোচ্চ ১,৫ মিলিয়ন কিউসেক। দিহাং ড্যাম এ প্লাবনের একমিলিয়ন কিউসেক এবং বাকি পানি সুবর্নসিড়ি হ্রাস করতে সক্ষম হবে[৯]।

ভারত তৃতীয় তিপাইমুখ ড্যাম নির্মানের প্রস্তাব করে বরাক নদীর উপর। এটি উল্লেখিত দু'টির চেয়ে ছোট। এ ড্যাম ৬ মিলিয়ন একর ফুট পানি সংরক্ষন এবং ৬০০ মেগাওয়াট জল বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে। ভারতের মতে, ইহা বাংলাদেশের সিলেট ও ঢাকা সহ ভারতের কিছু অংশের বন্যা নিয়ন্ত্রনে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখবে[১০]।

ভারতের হিসাব অনুযায়ী এই পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত বাঁধ সমূহ, ব্যারাজ সংযোগ খালের জন্য মোট খরচ হবে প্রায় ১২,৫০০ মিলিয়ন ডলার। শুধুমাত্র সংযোগ খালের জন্যই খরচ পড়বে প্রায় ৩,০০০ মিলিয়ন ডলার। বৈদ্যতিক যোগাযোগের সরঞ্জামাদি, বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ, অন্যান্য খাল এবং নৌ-চলাচলের খরচ এ হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি। বাংলাদেশের হিসাব মতে, ভারতের হিসাব অনেক কম। প্রকৃত পক্ষে ভারতের প্রস্তাব বাস্তবায়নে মোট খরচ পড়বে ৩৩,০০০ মিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশের প্রস্তাব

বাংলাদেশ সরকার বিশ্বাস করে যে, শুস্ক মৌসুমে ব্রক্ষ্মপুত্রের পানি স্থানান্তরিত করে গংগায় পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করা উত্তম পন্থা নয়। বাংলাদেশের অভিমত হল, গংগার শাখা নদী গুলোতে বর্ষা কালীন অতিরিক্ত প্রবাহিত পানি সংরক্ষন করে শুস্ক মৌসুমের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। এই বর্ষাকালীন অতিরিক্ত পানি সংরক্ষন করে ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশ এই তিনটি দেশই তাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম[১১]।

৯. *Ibid.*
১০. *Ibid.*
১১. *Ibid*, P- 176.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ গংগায় বার্ষিক গড় প্রবাহের সমীক্ষা শেষে প্রস্তাব করে যে, গংগায় বর্ষাকালে প্রবাহিত পানির বিপুল পরিমান অব্যবহৃত অবস্থায় সাগরে চলে যায়। উক্ত পানি সংরক্ষন করে শুস্ক মৌসুমে গংগার পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন গংগা অববাহিকার তিনটি দেশ ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের সমম্বিত প্রয়াস। কারন গংগার পানি উন্নয়ন বিষয়টি বাস্তবিক পক্ষে একটি আঞ্চলিক ব্যাপার। এ পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন গংগায় পানির সাধারন প্রবাহের সমীক্ষা এবং গংগা অববাহিকার দেশ গুলোর চাহিদা সমীক্ষা[১২]।

অববাহিকার তিনটি দেশের প্রয়োজনীয় পানির বিবরন নিম্নরুপঃ-

বাংলাদেশঃ- ২০০০ সাল পর্যন্ত গংগা নদী থেকে বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় পানি। (ক) শুস্ক মৌসুমে কৃষি, গ্রাম ও শহরের জন্য ব্যবহার, লবনাক্ততা দূরীকরন এবং নৌ- চলাচলের জন্য = ৪২.০৪ MAF

(খ) বর্ষাকালে প্রয়োজন = ৬.৪৫ "

মোট = ৪৮.৪৯ MAF

ভারতঃ- ২০০০ সাল পর্যন্ত গংগা নদী থেকে ভারতের প্রয়োজন। (ক) সমম্বিত কৃষি উন্নয়ন কমিশনের মতে, কৃষি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন------------------------= ১৫০.০০ MAF

(খ) শুস্ক মৌসুমে কোলকাতা বন্দরের জন্য প্রয়োজন(নভেঃ-মে)= ১৭.৩৬ "

(গ) বর্ষাকালে (জুন-অক্টোবর) প্রয়োজন---------------------= ১২.৪০ "

মোট =১৭৯.৯৬ MAF

নেপালঃ- কৃষি ও অন্যান্য কাজের জন্য ২৪+৬ = ৩০.০০ MAF

অববাহিকার তিনটি দেশের ২০০০ সাল পর্যন্ত সর্বমোট পানির দাবী বা প্রয়োজন হবে প্রায় ২৫৯ MAF. ফারাক্কায় উজানে ভারতের গংগায় পানি ব্যবহারের পরে ফারাকায় বছরে মোট পানি প্রবাহ ৩৭২ MAF. কাজেই দেখা যায় যে, তিনটি দেশের প্রয়োজন মেটানোর পরও পর্যাপ্ত পানি উদ্বৃত্ত থাকে[১৩]। যদি বর্ষার প্রচুর পানি প্রবাহের কিছু অংশ পানির আধার নির্মান করে ধরে রাখা হয়।

১২. Begum Khurshida, "*Tension Over the Farakka Barrage*"(UPL, Dhaka, 1987) P- 192.
১৩. *Ibid*, P- 193.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ মনে করে গংগা অববাহিকার উজানে নেপাল ও ভারতে পানি সংরক্ষন করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। ভারতে গংগা অববাহিকায় পানি সংরক্ষনাগার নির্মানের ৫১টি স্থান রয়েছে। তার মধ্যে ২৯টি নির্মান করা হয়েছে এবং ২২টি পরিকল্পনাধীন রয়েছে। বাংলাদেশের সমীক্ষা অনুযায়ী নেপালে গংগা নদীর বিভিন্ন উপ-নদীতে প্রায় ৩১টি পানির আধার নির্মান করা সম্ভব। বাংলাদেশের প্রস্তাবে এর মধ্যে ৭টি অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে যা নির্মান করলে তিন দেশের শুস্ক মৌসুমের পানির প্রয়োজন মেটানো সম্ভব। উক্ত ৭টি আধারের নাম হচ্ছেঃ কালিগন্ডকি-১, কালিগন্ডকি-২, চিসাপানি, ত্রিশূল গংগা, সেতি, সপ্তকোশি ও পঞ্চশ্বর। কাজেই শুস্ক মৌসুমে গংগার পানি বৃদ্ধির পূর্ন সম্ভাবনা নেপালেই রয়েছে। এ ছাড়া নেপালের তরাই অঞ্চলে ভু-গর্ভস্থ পানি প্রবাহ ও পানির চাহিদা মেটাতে সহায়ক হবে। নেপালে প্রস্তাবিত পানির আধারে জমা পানি প্রাকৃতিক নদী খাল দিয়ে প্রবাহিত করে গন্ডকি এবং কোশি নদীর পানি নেপালের তরাই এলাকা বরাবর খাল খনন করে ভারতে এবং বাংলাদেশে প্রবাহিত মহানন্দা, করতোয়া ও আত্রাই নদীতে প্রবাহিত করা যায়। এই পানি শুস্ক মৌসুমে পশ্চিম বাংলার মহানন্দা নদী ও বাংলাদেশের করতোয়া নদীর পানি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। তরাই এলাকা থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত খাল কাটলে নেপালের সমুদ্রে যাওয়ার ও একটি আন্তর্জাতিক নৌ-চলাচলের পথ তৈরী হতে পারে।

নেপালে বাংলাদেশের প্রস্তাবিত পানির আধার থেকে স্বল্প ব্যয়ে প্রচুর পরিমানে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, যা এ অঞ্চলের শিল্প ও বানিজ্যের উন্নতি বিধানে সহায়ক হবে। বাংলাদেশের প্রস্তবিত ৭টি ড্যাম থেকে ৫,০০০ মেঘাওয়াট হারে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব, যার স্থাপিত ক্ষমতা হবে ১১,৫০০ মেঘাওয়াট। ৭টি ড্যাম নির্মানে আনুমানিক খরচ হিসাব করা হয়েছে ১৭,০০০ মিলিয়ন ডলার[১৪]।

বাংলাদেশের প্রস্তাবের ভাল দিক গুলোঃ-

১। পানি সম্পদ উন্নয়নে গোটা গংগা অববাহিকা সর্বাধিক অনুকূল।

২। শুস্ক মৌসুমে গংগার পানি প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে অববাহিকায় কৃষি- সেচ ও অন্যান্য চহিদা পূরন সম্ভব পর হবে।

১৪. **Abbas B.M. AT**, "*Ganges Waters Dispute*",(UPL, Dhaka, 1982), P.P- 135-136.

Dhaka University Institutional Repository

৩। গংগা অববাহিকায় বন্যা প্রকোপ হ্রাস সম্ভব।

৪। স্বল্প ব্যয়ে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন করে নেপালের নিজস্ব চাহিদা পূরন করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে বিদ্যুৎ রপ্তানির মাধ্যমে এ অঞ্চলের শিল্প উন্নয়ন তরান্বিত করা সম্ভব।

৫। নৌ-চলাচল ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব।

৬। পানি সরবরাহের গুনগত ও পরিমানগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে অববাহিকায় ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরনে সক্ষম হবে।

৭। গংগার ভাটি অঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের লোনা পনির প্রকোপ নিয়ন্ত্রন সম্ভব।

৮। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের মাধ্যমে বিপদ জনক পরিবেশ দূষন থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

৯। আন্তর্জাতিক পানি নীতিমালায় উপকারিতা গংগা অববাহিকার দেশ গুলোতে পৌছে দেয়া সম্ভব[১৫]।

বাংলাদেশের প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতের মন্তব্যঃ-

ভারত বাংলাদেশ কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাবকে সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ নয় বলে সমালোচনা সহ মন্তব্য করে যে, "*সমীক্ষার মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়নি এবং প্রকৌশলগত দিক দিয়ে ইহা গ্রহন যোগ্য নয়।*" বাংলাদেশের প্রস্তাবিত পানি সংরক্ষনাগারটি পৃথিবীর বৃহত্তম পর্যায়ের বিধায় এটি অসম্ভব এবং অবাস্তব কল্পনামাত্র। তা ছাড়া ভারতের বর্তমান সংরক্ষনাগার গুলো স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যে গুলো নির্মান করা হবে তাও তার স্থানীয় প্রয়োজনে লাগবে। ভারতে কোন প্রকার সংরক্ষনাগার নির্মান করলে তা ফারাক্কার পানি প্রবাহ বৃদ্ধিতে কোন উপকারে আসবে না। তা ছাড়াও নেপালের তরাই নদীর সাথে গন্ডক ও কোশি নদীর সংযোগ নির্মানের ধারনাও গন্ডক ও কোশি নদীর পানি ভারতের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের করতোয়া আত্রাই ও বড়াল নদীর পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা মোটেই সমর্থন যোগ্য নয় বলে ভারতের অভিমত[১৬]।

১৫. **Bagum Khurshida**, "*Tension over the Farakka Barrage*",(UPL, Dhaka, - ১৯৪৭), P- ১৯৭.
১৬. *Ibid, P- 197.*

Dhaka University Institutional Repository

ভারত ব্যাপারটিকে দ্বি-পাক্ষিক বলে মনে করে। তাই সে নেপালের উপস্থিতি মোটেই কাম্য নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করে। বাংলাদেশ প্রস্তাবিত নেপালে ৭টি ড্যাম নির্মান যথাঃ **কালিগন্ডকি-১ এবং ২, চিসাপানি, ত্রিশূল** গংগা, সেতি, **সপ্তকোশি** ও **পঞ্চেশ্বর** নির্মানে ১৭ বিলিয়ন ডলার খরচ হবে বলে যে হিসাব উল্লেখ করেছে ভারতের কাছে তা অবাস্তব।

ভারতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে বাংলাদেশের মন্তব্যঃ-

"গংগা অববাহিকার স্থানীয় প্রয়োজন মেটানো এবং প্রবাহ বৃদ্ধি করার মত *যথেষ্ট পানি নেই।"* ভারতের এ মন্তব্যে বাংলাদেশ দ্বিমত পোষন করে। ব্রহ্মপুত্র থেকে গংগা পর্যন্ত সংযোগ খাল কেটে ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রবাহ গংগায় স্থানান্তরের যে প্রস্তাব ভারত দিয়েছে তা অববাহিকার পানি স্থানান্তর সম্পর্কিত নীতিমালার পরিপন্থি। তবে হ্যাঁ যে অববাহিকা বা এলাকা থেকে পানি স্থানান্তর হবে তার সর্বপ্রকার বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যতের চাহিদা মেটানোর পর যদি পানি উদ্বৃত্ত থাকে তবে তাই শুধু স্থানান্তর করা যাবে।

বাংলাদেশ ভারতের প্রস্তাব সমীক্ষা করে দেখেছে যে, ব্রহ্মপুত্রের পানি স্থানান্তর করে গংগার প্রবাহ বাড়াতে গেলে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় পানির টান পড়বে। এবং বাংলাদেশের পারিপার্শ্বিক ও জন জীবনের বিশেষ ক্ষতি হবে। প্রাকৃতিক পয়:নিষ্কাষন ব্যবস্থা এবং নদী শাসনে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। ভারতীয় প্রস্তাব কার্যকরী করা হলে ব্রহ্মপুত্র এলাকার বিপুল জনগোষ্ঠী বাস্তুহারা হবে এবং এ অঞ্চলের পরিবেশগত ভারসাম্য চরম ভাবে বিঘ্নিত হবে। এ ছাড়া জলাবদ্ধতার মাধ্যমে বন্যা সৃষ্টি, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, পানির লবনাক্ততা বৃদ্ধি এবং পলি পড়ে নদীর গতিপথ বন্ধ হয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে বলে বাংলাদেশ মনে করে।

ব্রহ্মপুত্র নদী বাংলাদেশের ৫০ ভাগ এলাকার ৬০ ভাগ লোকের জল সমস্যা সমাধানে নিবেদিত। এখানে ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শুধুমাত্র কৃষি ও শিল্পেরই ক্ষতি হবে না, এর সাথে ক্ষতি গ্রস্থ হবে মৎস ও বন বিভাগ। সাথেই সমস্যা দেখা দিবে পুন:র্বাসনের। কেননা এতে এক মিলিয়ন জনগন তাদের বসত বাড়ি ও জমি হারাবে, যে জমি ও বসত বাড়ি ফিরিয়ে দেয়া সম্পূর্ন অসম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবিত খালটির দৈর্ঘ্য ৩২৪ কিলোমিটার, প্রস্থ ০.৮ কিলোমিটার, গভীরতা ৯ মিটার এবং ধারন ক্ষমতা হবে ২,৮৩২ কিউসেক যা পৃথিবীর বৃহত্তম খাল। বাংলাদেশের মতে ৪০ কিলোমিটার ফারাক্কা ফিডার ক্যানেল নির্মানে ১১ বছর লেগেছে এবং জরিপ কাজ চলেছে শতাব্দী ধরে, কাজেই "*এ খাল খননের পূর্বে মানুষ চাঁদে পৌঁছে যাবে*।" বাংলাদেশ ভারতের সাথে এ সমন্বিত প্রকল্প গ্রহনে অসম্মত[১৭]।

ভারতের এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কেবল মাত্র বাংলাদেশেই নয় ভারতের অভ্যন্তরেই বিরূপ মত রয়েছে। অনেকে এ পরিকল্পনাকে কল্পনা প্রসূত বলে আখ্যায়িত করেছে। আসামেও এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ***আসাম ইনষ্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট ষ্টাডিজ*** এ পরিকল্পনার উপর এক সমীক্ষা শেষে মন্তব্য করেছে যে, যদিও ব্রহ্মপুত্রের প্রচুর পানি সম্পদ আছে তবুও এর মাত্র শতকরা ১০ ভাগ অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহার করা যায়। এ সংস্থা আরও বলেছে যে, শুস্ক মৌসুমে ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রবাহ তার নিজের অববাহিকার জন্যই পর্যাপ্ত নয়; অন্য অববাহিকার জন্য এ নদীর পানি স্থানান্তরের প্রশ্নই ওঠে না[১৮]।

ভারতের দ্বি-পাক্ষিক নীতিঃ-

ভারতের মতে, নেপালে অবস্থিত গংগার উপ-নদী উন্নয়নের ব্যপার সম্পূর্ন ভাবে ভারত ও নেপালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একদিকে নেপালের ভাটির দেশ হয়ে ভারত নেপালের উন্নয়ন কর্মকান্ডে শরীক হওয়ার দাবি করে। আবার অন্য দিকে ভারত তার ভাটিতে অবস্থিত বাংলাদেশকে গংগার সম্মিলিত পানি উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে বাদ দিতে চায়। এ বিপরীত মুখী আচরণে ভারতের যুক্তির চেয়ে সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীই বেশি প্রতিফলিত হয়। এটি আরও প্রকট হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক নদী গংগার পানি সম্পদ উন্নয়নে তার দ্বি-পাক্ষিক নীতিতে জোর দেয়াতে। আসল কথা হল গংগা তিনটি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী। এবং এ বিষয়ে ভারতের দ্বি-পাক্ষিক নীতিতে যুক্তি খুবই কম। নদী যখন আন্তর্জাতিক, তখন তার পানি সম্পদ উন্নয়নে দ্বি-পাক্ষিক ব্যবস্থা প্রযোজ্য হতে পারে না।

১৭. *Ibid, p- 198.*
১৮. **Abbas B.M. AT**, "*Ganges Waters Dispute*" (UPL, Dhaka, 1982), P- 139.

Dhaka University Institutional Repository

ভারত দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার উপরে জোর দেয়, আলাদাভাবে ভারত ও নেপাল এবং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সর্বাধিক লাভ আদায় করতে। ভারত শুস্ক মৌসুমে নিজের দেশের গংগায় প্রবাহ, বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বর্তমানে প্রবাহিত পানি এবং নেপালের বিভিন্ন পানির আধারে সংরক্ষিত পানির সবটাই তার নিজের ব্যবহারে লাগাতে চায়। ভারতের সংযোগ খালের প্রস্তাবের আর এক লক্ষ্য হল, ভারতের পূর্বাঞ্চল হতে পশ্চিম অঞ্চলে সংযোগকারী নদী পথ প্রতিষ্ঠা করে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করা।

বাংলাদেশের পরিকল্পনা মোতাবেক সকল উন্নয়ন কাজ গংগা অববাহিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এর ফলে এ এলাকার দেশ সমুহ বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হবে। বাংলদেশের প্রস্তাবিত গংগায় পানির আধার নির্মানে ভারতের প্রস্তাবিত সংযোগ খালের চেয়ে কম খরচ পড়বে। ভারতীয় প্রস্তাবে বাংলাদেশ সামান্যই উপকৃত হতে পারে, বরং এটা বাংলাদেশে নানা সমস্যার সৃষ্টি এবং বিপুল ক্ষতি করবে। তাই ভারতের প্রস্তাব গ্রহনযোগ্য নয় বরং এটি নিস্প্রয়োজন, অধিক ব্যয়বহুল এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে অযৌক্তিক।

১৯৭৭ সালে প্রথম পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে গংগায় শুস্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি সম্পর্কে অসংখ্যবার আলোচিত হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছা যায়নি এবং অচলাবস্থা কাটেনি। এর অন্তর্নিহিত কারন হল কে বেশি রাজনৈতিক ভাবে শক্তিশালী তা প্রমান করা। দু'দেশের পারস্পরিক প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিকল্পনার মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের ইঙ্গিত রয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প সম্পর্কিত আলোচনার মারপ্যাচে ও ভাবাগত কৌশলে রাজনৈতিক চিহ্ন সুস্পষ্ট।

ফারাক্কা সমস্যার মূল প্রশ্ন হচ্ছে কে বা কারা নদী নিয়ন্ত্রন করবে? কিভাবে পানি বন্টন হবে? কিভাবে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা পাবে? বাংলাদেশ সরকার মনে করে ভারতীয় প্রস্তাব বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থি ও হুমকি স্বরূপ। ভারত সরকারের প্রস্তাবিত ব্রহ্মপুত্র গংগা সংযোগ খাল বাংলাদেশের পানি সম্পদ ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ। এতদ্বসত্বেও দু'দেশ শুস্ক মৌসুমে পানি বন্টনের ব্যাপারে সম্ভাব্য প্রকল্প সম্পর্কে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। প্রকৃত পক্ষে ব্যাপারটি হচ্ছে পরস্পরের জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এবং সে জন্যই এ নিয়ে দ্বন্দ[১৯]।

১৯. **Crow Ben,** "*Sharing the Ganges*",(UPL, Dhaka, 1995) P- 184.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ দৃঢ় মনোযোগের সাথে গংগার পানি উন্নয়নে আগ্রহী তবে সে ব্রহ্মপুত্রের পানি সম্পূর্ন বাংলাদেশের কাজে লাগিয়ে গংগার পানির প্রবাহ অন্য ভাবে বাড়িয়ে তার ন্যায্য হিস্যা চায়। কিন্তু যখনই দেখা যায় যে, ভারত নেপালের সংগে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনায় সমস্যার সমাধান করতে চায় তখনই ব্যাপারটি সন্দেহজনক হয়ে দাড়ায়।

পরিশেষে জোরালো ভাবে বলা যায় যে, সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সহযোগিতা। কেননা সৎ প্রতিবেশী সুলভ মানসিকতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া এ সমস্যার সমাধান আদৌ সম্ভব নয়।

১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহঃ-

১৯৮৫ সালের সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ শেষ হয় ১৯৮৮ সালের নভেম্বর মাসে। মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই বাংলাদেশে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে প্রলয়ংকারী বন্যায় দেশের চার ভাগের তিন ভাগ অঞ্চল পানির নিচে ডুবে যায়। জেনারেল এরশাদ এ বন্যাকে নজির বিহীন বিপর্যয় বলে উল্লেখ করেন। একই সাথে এটাকে মানুষের সৃষ্ট অভিশাপ বলে গালাগাল করে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট সাহায্যের আবেদন জানায়। এ বন্যায় ভারত কোন সাহায্য নিয়ে এগিয়ে না আসায় ভারতকে তিনি ***"কালপ্রিট"*** বলে গালি দেন। এই বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই জনগন এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন। এরশাদ এই গণরোষ মোকাবেলায় ভারত বিরোধী কথাবার্তা বলেন। ফলে ভারত বাংলাদেশের ব্যাপারে বিরক্তি বোধ করে[২০]।

বন্যা মোকাবেলার পরে পরিস্থিতি শান্ত হলে এরশাদ নিজ উদ্যোগে ১৯৮৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লী যান এবং ১৯৮৫ সালের সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু ভারত এর মেয়াদ বাড়াতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। অত:পর দু'দেশের বৈঠকে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ টাস্কফোর্স গঠন করা হয় এবং উক্ত টাস্কফোর্সকে বন্যা নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা ও গংগা নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধির স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব

২০. **Ahmad Tariq Karim**, "*Bangladesh-India Treaty on Sharing of the Ganges Water's: Genesis and significance*", **BIISS Journal**, Vol-19, No- 2, 1998, P-224.

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করেন। টাস্কফোর্সের মিটিংয়ে ভারত বাংলাদেশকে জোর দিয়ে জানায় যে, ১৯৭৮ সালের ভারতীয় প্রস্তাব মোতাবেক বাংলাদেশের উচিৎ ছিল বন্যার পূর্বাভাস সম্পর্কে সতর্ক থাকা[২১]।

১৯৮৫ সালের সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ সমাপ্তি শেষে ভারত একতরফা ভাবে ইচ্ছে মত তাদের প্রয়োজনীয় পানি প্রত্যাহার করে নেয়। ভারতের সাথে কোন আলোচনায় অগ্রগতি না হওয়ায় বাংলাদেশ পুনরায় জাতিসংঘে, কমনওয়েলথ এবং সার্ক ফোরামে বিষয়টি উত্থাপন করে। ফলে ভারতের সংগে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও অবনতি ঘটে।

দীর্ঘ তিন বছর আলোচনায় কোনরূপ অগ্রগতি ছাড়াই কেটে যাবার শেষে ১৯৯০ সালের এপ্রিল মাসে *জে, আর, সি,* এর বৈঠক বসে। কিন্তু অগ্রগতির মাত্রা নিতান্তই কম। অত:পর বাংলাদেশে দূর্বার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে জেনারেল এরশাদের পতন ঘটে[২২]। শুরু হয় নতুন যুগের।

২১. *Ibid.*
২২. *Ibid, P-225*

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৫

১৯৯১-৯৫ সাল পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহ,
১৯৯৬ সালের দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির স্বাক্ষর ও মূল্যায়ন ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১-৯৫ সাল পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহঃ-

সুদীর্ঘ ন'টি বছর স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পর ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বৈর শাসনের অবসান ঘটে। নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত সাধারন নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে বি, এন, পি সরকার এবং প্রধান মন্ত্রী হন বেগম খালেদা জিয়া। বাংলাদেশের পরিস্থিতি শান্ত হলেও ঠিক এ সময় ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত অস্থিতিশীল। ১৯৯১ সালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী মি: রাজীব গান্ধী আততায়ীর হাতে নির্মম ভাবে নিহত হলে এক হৃদয় বিদারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ভারতে প্রধান মন্ত্রী হন মি: নরসীমা রাও। রাজনৈতিক অবস্থা কিছুটা শান্ত হয়ে আসলে ১৯৯২ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে বেগম খালেদা জিয়া নরসীমা রাও এর সাথে নতুন দিল্লীতে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা দু' জনে একমত হন যে, পুনরায় পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে একটি গ্রহন যোগ্য সমাধান প্রয়োজন এবং তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শুষ্ক মৌসুমে ফারাক্কার পানি বন্টনের একটি অন্তবর্তীকালীন সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। অচলাবস্থা তরান্বিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রী পর্যায়ে ঢাকায় ১৯৯২ সালের ২৬-২৭ আগষ্ট মিটিং এ বসেন। এবং এটাকে কেন্দ্র করে সচিব পর্যায়ে ও ঢাকা ও দিল্লীতে আলোচনা বৈঠক বসে। কিন্তু কোন অর্জন বা সিদ্ধান্ত গ্রহন করা সম্ভব হয়নি[১]।

আলোচনায় ব্যর্থতার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল গুলো ভারতের অব্যাহত একতরফা ভাবে পানি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহন করে। তারা ১৬ মার্চ ১৯৯৩, ***"ফারাক্কা দিবস"*** পালন করে এবং ভারতীয় হাই কমিশনের সামনে রাও বিরোধী শ্লোগান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বেগম জিয়া অভ্যন্তরীন রাজনীতির চাপে পড়ে বিষয়টি ভারতের বিরুদ্ধে ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে উত্থাপন করেন। সম্মেলনে দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত একটি স্বল্পমেয়াদী সমাধানের পরামর্শ প্রদান করে। কিন্তু ভারত তার

১. Swain Ashok, *"The Environmental Trap"*, Report No- 44, 1995,(Uppsala University, Sweden), P-47.

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তে সংযোগ খাল সম্পর্কিত প্রস্তাব পেশ করে। ফলে অন্তবর্তীকালীন কিংবা স্বল্পকালীন কোন সমঝোতাই সম্ভব হয়ে না ওঠায় বাংলাদেশ পুনরায় পানি বন্টন সমস্যাকে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা বলে ঘোষনা করে[২]।

বেগম জিয়া ১৯৯৩ সালের ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারন পরিষদের ৪৮তম অধিবেশনে বিষয়টি উথাপন করে বলেন, "*ভারত কর্তৃক একতরফা ভাবে আন্তর্জাতিক নদী গংগার পানি নিজস্ব স্বার্থে প্রত্যাহার করার ফলে বাংলাদেশের অভাবনীয় ক্ষতি হচ্ছে, দিন দিন বাংলাদেশের অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়ছে এবং পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।*" এতদসত্ত্বেও ভারত এর কড়া প্রতিবাদ সহ বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। অত:পর বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষনের মাধ্যমে ফারাক্কা সমস্যা সম্পর্কে প্রচার করতে থাকে। ১৯৯৩ সালের কমনওয়েলথ সরকার প্রধানদের সাইপ্রাস মিটিং -এ বেগম জিয়া ভারত কর্তৃক ফারাক্কার পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের অবর্ননীয় ক্ষতির কথা উল্লেখ করেন। ১৯৯৪ সালে নেপাল সফরের সময় বেগম জিয়া কাঠমুন্ডুতে ফারাক্কা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং এ সমস্যা নিরসনে "***ত্রিদেশীয় কাঠামো***"-এর মাধ্যমে সমাধানের আশা ব্যক্ত করেন। শুধু মাত্র সরকারের মাধ্যমেই নয় বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী নাগরিকরা সেমিনার, শ্লোগানে ও প্রতিবাদে মুখরিত করে তোলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজধানী। বাংলাদেশের জন্য যখন সমস্যাটি দিন দিন হতাশা ও নিরাশার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এমনি এক সময় কিউবা থেকে আগত রাষ্ট্রদূত যখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির নিকট তার পরিচয় পত্র পেশ করেন, রাষ্ট্র পতি পরিচয় পত্র গ্রহন করে ফারাক্কা সংক্রান্ত কিউবান সমর্থন লাভ সংক্রান্ত একটি কাগজ তার হাতে তুলে দেন। এখানেই শেষ নয়। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চীনা বিদেশ মন্ত্রী ঢাকা সফরে আসেন, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী তার সাথে বিষয়টি আলোচনা করেন। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে বেগম জিয়া যখন জাপান সফরে যান তখন তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ফারাক্কা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও সমর্থন আদায়[৩]।

২. *Ibid, P-48.*
৩. *Ibid, P.P- 48,59.*

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের জীবন মরন সমস্যা যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে না জানিয়ে উপায় ছিলনা অথচ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জানানোর ফলে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে। কোন রকম দ্বি- পাক্ষিক আলোচনার পথও বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জানানোর পরেও যখন কোন সমাধান হয়নি তখন বাংলাদেশ পুনরায় দ্বি- পাক্ষিক আলোচনার চাপ প্রয়োগ করে। অত:পর ১৯৯৫ সালের মে মাসে দু' দেশের প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে নতুন দিল্লীতে মিটিং এর মধ্যদিয়ে পুনরায় দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা শুরু হয়। এরই সূত্র ধরে ১৯৯৫ সালের জুন মাসে ঢাকায় পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে মিটিং-এ দীর্ঘ চার বছর বিরতির পর যৌথ নদী কমিশনের মিটিং করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই মিটিং-এ ভারতের পররাষ্ট্র সচিব জোর দিয়ে বলেন যে, ফারাক্কা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হলে নেপালকে এর সাথে যুক্ত করার পরিকল্পনা বাংলাদেশকে সম্পূর্ন রুপে বাদ দিতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, ব্রহ্মপুত্রের সংযোগ খাল নির্মানের প্রস্তাব বাংলাদেশকে অবশ্যই গ্রহন করতে হবে। এছাড়া ভারত ফারাক্কার পানি বন্টনের কোন স্বল্প মেয়াদী চুক্তি করতেও রাজি নয়[৪]।

অত:পর ক্ষমতাশীন বি,এন,পি সরকারের অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং অন্ত:বর্তীকালীন সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার দাবিতে যুগপৎ আন্দোলন পরিচালিত হয়। বি, এন, পি সরকার গণ দাবির মুখে পদত্যাগ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে এবং একটি অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। উক্ত নির্বাচনে সুদীর্ঘ একুশ বছর পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। নতুন সরকারের প্রধান মন্ত্রী হন শেখ হাসিনা। অন্যদিকে ১৯৯৬ সালের মে মাসের ভারতীয় সাধারণ নির্বাচনে ইউনাইটেড ফ্রন্ট জয়লাভ করে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। প্রধান মন্ত্রী হন মিঃ দেব গৌড়।

১৯৯৬ জুলাই- ডিসেম্বর ঘটনা প্রবাহ ও দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর।

পরিবর্তনের শুভ সূচনা নিয়ে দু'টি দেশে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সৎ প্রতিবেশী সুলভ মানসিকতা নিয়ে দু' দেশের মধ্যকার দীর্ঘ দিনের তিক্ত সম্পর্ক উন্নয়নের গভীর বাসনা নিয়ে এগিয়ে আসে

৪. *Ibid, P.P-49,50*

Dhaka University Institutional Repository

উভয় সরকার। তাঁরা উপলব্ধি করল যে, আসন্ন শুষ্ক মৌসুমের পূর্বেই ফারাক্কার পানি বন্টন সমস্যার একটি সুষ্ঠু সমাধান হওয়া প্রয়োজন[৫]।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব ১৯৯৬ সালের ৬-১০ আগষ্ট ভারত সফরে যান আলোচনার ক্ষেত্র তৈরী করার জন্য। ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী তাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, গংগার পানি সমস্যার সমাধান হলে আমরা অন্যান্য সমস্যাগুলি সমাধানের পদক্ষেপ নিতে পারব। এ সফরে সচিব ও ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী আই.কে গুজরাল এবং পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মি: জ্যোতি বসুর সঙ্গে কথা বলেন। এবং মি: বসুকে পানি সমস্যা সমাধানের জন্য বিষয়টি সমর্থন জানাতে অনুরোধ জানান। যাতে সমস্যার দ্রুত একটি সমাধান হয়। মি: জ্যোতি বসু অনুরোধ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং সম্ভাব্য সর্বাত্মক সাহায্য করার আশ্বাস দেন[৬]।

ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ৬-৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং গংগার পানি বন্টন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। দু' পক্ষই সম্মত হন যে, দু'দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী, সচিব এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি গঠন করে যত দ্রুত সম্ভব সমস্যার সমাধান সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে। তারা পর পর চারটি মিটিং-এ সমঝোতায় উপনীত হলেন।

যৌথ কমিটি দু'দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের অধীনে থাকবে এবং পুরাতন কমিটি যেটি যৌথ পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের অধীনে ছিল তা বাতিল করা হয়। অত:পর পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে বিশেষজ্ঞ দের ডাকা হল। এবং পানি বন্টনের যত প্রকার অসতর্কতা ও প্রকৌশল গত সমস্যা থাকতে পারে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত করা হল[৭]।

উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রী ১৯৯৬ সালের ২৮ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ভারতে সফর করেন এবং ভারতীয় পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের সাথে পানি বন্টন সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং [illegible] তিনি আরো কথা বলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় ও ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের সাথে।

৫. **Ahmad Tariq Karim**, "*The Bangladesh-India Treaty on Sharing of the Ganges Water's: Genesis and significance*", **BIISS Journal**, Vol-19, No-2, 1994, P-227.
৬. *Ibid*.
৭. *Ibid*, P.P- 227, 228.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৬ সালের ০৯ ১৩ নভেম্বর বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভারতে যান এবং পুনরায় পানি বন্টন চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেন। দু' পক্ষই আলোচনায় আসন্ন শুষ্ক মৌসুমের পূর্বেই নিরপেক্ষ ও সুষম একটি পানি বন্টন চুক্তি সম্পর্কে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী তার প্রতি পক্ষ মি: গুজরালের এবং ভারতীয় প্রধান মন্ত্রীর সাথে প্রয়োজনীয় এবং ফলপ্রসূ আলোচনা করেন। অত:পর বিশিষ্ট রাজনীতি বিদদের যারা কোয়ালিশন সরকারের শরীক ও বিরোধী দলের সংগে সন্তোষজনক আলোচনা করেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী কোলকাতা যান এবং মি: জ্যোতি বসুর সমর্থন সূচক মতামত গ্রহন করেন। কেননা বিষয়টির অগ্রগতির সিংহভাগ পশ্চিম বঙ্গের মতামতের উপর নির্ভরশীল[৮]।

পশ্চিম বঙ্গের মূখ্য মন্ত্রী মি: জ্যোতি বসুর ১৯৯৬ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সফর কালীন দু' সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় জ্বালাময়ী পানি বন্টন সমস্যার উন্নতি সাধনে বন্ধুত্বপুর্ন এক সমাধানে উপনীত হন। এ সফরের সময় মি: বসু বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সংগে গুরুত্ব পূর্ন আলোচনা করেন। এ ছাড়াও এ সময় পশ্চিম বঙ্গের অর্থ মন্ত্রী, উচ্চ পদস্থ অফিসার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যায়ের এ আলোচনা খুবই গুরুত্ববহ, কেননা এর মাধ্যমে সংকীর্ন মানসিকতা পরিহার করে পরস্পরকে সেতু বন্ধনে আবদ্ধ হতে সাহায্য করেছে[৯]।

উভয় দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দদের মধ্যে যখন আলোচনা চলছিল তারই মধ্যে যৌথ কমিটি বেশ ক'বার মিলিত হন এবং চুক্তির কৌশল গত দিক আলোচনার মাধ্যমে সর্ব সম্মত একটি খসড়া দু'সরকারের সামনে পেশ করেন। যৌথ কমিটি ৫-১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত নতুন দিল্লিতে এ অব্যাহত আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্ব শেষ করেন। বাংলাদেশের পক্ষে কমিটির নেতৃত্ব দেন প্রধান মন্ত্রীর সচিব এবং ভারতীয় পক্ষের নেতৃত্ব দেন সে দেশের পররাষ্ট্র সচিব। চুক্তির মেয়াদ নির্ধারিত হয় ত্রিশ বছর এবং এতে স্বাক্ষর করেন দু' দেশের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়[১০]।

৮. *Ibid, P-228.*
৯. *Ibid , P-229.*
১০ *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৬ সালের চুক্তির প্রকৃতি ও বিষয় বস্তুঃ-

১৯৯৬ সালের ১০-১২ ডিসেম্বর তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে থাকা কালীন বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লীতে সে দেশের প্রধান মন্ত্রীর সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এবং সমঝোতার মাধ্যমে ১২ ডিসেম্বর ত্রিশ বৎসর মেয়াদী ঐতিহাসিক পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন দু'দেশের প্রধান মন্ত্রীদ্বয়। চুক্তির গুরুত্ব পূর্ন দিক গুলো নিম্মরুপঃ-

চুক্তির শিরোনামটি শুরু হয়েছে এভাবে, "দু'দেশের জনগনের কল্যান সাধনের অভিন্ন লক্ষ্যে অনুপ্রানিত হয়ে বন্ধুত্বপূর্ন ও সু-প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক উন্নয়ন এবং জোরদার করায় দৃঢ় প্রত্যয়ে পারস্পারিক সমঝোতার মাধ্যমে উভয় দেশের ভূ- খন্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদীর পানি বন্টন এবং দু'দেশের জনগনের পারস্পরিক কল্যানে বন্যা ব্যবস্থা পনা, সেচ, নদী অববাহিকার উন্নয়ন ও পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনে এই অঞ্চলের পানি সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে এই চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে।" একটি সুষ্ঠু ও ন্যায় সংগত সমাধান খুঁজে বের করার লক্ষ্যে এই চুক্তিতে কোন পক্ষের অধিকার ও স্বার্থ ক্ষুন্ন না করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

১৯৯৬ সালের দীর্ঘ মেয়াদী এ চুক্তি কোন তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি ছাড়াই দ্বি- পাক্ষিক আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে। অনুচ্ছেদ-১ ভারত বাংলাদেশকে যে পরিমান পানি দিতে সম্মত তা ছাড়া হবে ফারাক্কায়। অনুচ্ছেদ- ২ (১) প্রতি বছর ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কে শুস্ক মৌসুম হিসাবে ধরা হয়েছে। এবং এ সময়ে গংগার পানি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্টনের সূত্র হল অনুচ্ছেদ-২ (২) পরিশিষ্ট- ২ নং কলামে বর্নিত পানির পরিমান, যার ভিত্তি হচ্ছে ১৯৪৯-১৯৮৮ পর্যন্ত ফারাক্কায় রেকর্ডকৃত ৪০ বছরের গড় প্রবাহের নির্ভর যোগ্যতার উপর। এবং এ গড় প্রবাহ বজায় রাখার জন্য উজানের দেশ সর্বাত্মক চেষ্টা চালানোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে।

অনুচ্ছেদ- ২ (৩) বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব পুর্ন, এখানে বলা হয়েছে যে, সংযোজিত পরিশিষ্ট তফশিলের চার নং কলামে প্রদর্শিত পরিমান পানি ১০ দিন মেয়াদের হিসেবে ছাড়া হবে। তবে যদি কোন ১০

Dhaka University Institutional Repository

দিনের সময় কালে ফারাক্কায় পানি প্রবাহ ৫০ হাজার কিউসেকের নিচে হ্রাস পায় তাহলে দু'সরকার কোন পক্ষের ক্ষতি না করে সমতা ও ন্যায় পরায়নতার নীতি মালার ভিত্তিতে জরুরী ভাবে পানি প্রবাহে সমন্বয় সাধনের জন্য অবিলম্বে আলোচনায় বসবে।

অনুচ্ছেদ- ৭ যৌথ কমিটি যে কোন মত পার্থক্য ও মতবিরোধ নিষ্পত্তি করবে। তবে তারা ব্যর্থ হলে যৌথ নদী কমিশনে উপস্থাপন করবে। এবং তারাও ব্যর্থ হলে দু'সরকারের নিকট বিষয়টি উপস্থাপিত হবে। দু' সরকার জরুরী ভিত্তিতে আলোচনায় মিলিত হবেন।

অনুচ্ছেদ- ৮ দু'সরকার শুস্ক মৌসুমে গংগায় পানি প্রবাহ বৃদ্ধির দীর্ঘ মেয়াদী সমাধানের জন্য পারস্পারিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে।

অনুচ্ছেদ- ৯ পারস্পারিক ক্ষতি না করার নীতির ভিত্তিতে দু'সরকার অন্যান্য অভিন্ন নদী সমূহের পানি বন্টনের বিষয় চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হয়েছে।

আনুচ্ছেদ- ১০ প্রতি পাঁচ বছর পর সমতা ও স্বচ্ছতা নিরুপনের জন্য পর্যালোচনা অথবা কোন পক্ষ দাবি জানালে এর পূর্বেও পর্যালোচনা করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ছাড়াও চুক্তির ব্যবস্থা সমূহের কার্যকারিতা ও প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করার ভিত্তিতে যে কোন পক্ষ দু'বছর পর প্রথম পর্যালোচনা আহবান করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ- ১২ চুক্তির মেয়াদ ৩০ বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এর পর পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে চুক্তিটি নবায়ন করার ব্যবস্থা রয়েছে ।

পরিশিষ্ট- ১ অনুসারে ফারাক্কায় পানির প্রাপ্যতা ৭০,০০০ কিউসেক বা তার কম হলে উভয় দেশ ৫০-৫০ হারে পাবে । ফারাক্কায় পানির প্রবাহ ৭০,০০০ কিউসেক থাকলে বাংলাদেশ পাবে ৩৫,০০০ কিউসেক এবং বাকি অংশ পাবে ভারত। তবে পানির প্রবাহ ৭৫,০০০ কিউসেকের উপরে

Dhaka University Institutional Repository

বা বেশি হলে ভারত ৪০,০০০ কিউসেক এবং বাকি অংশ বাংলাদেশ পাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-২ অনুসারে শুস্ক মৌসুমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন সময় এপ্রিল মাসের প্রথম ও শেষ দশ দিন বাংলাদেশের ৩৫,০০০ কিউসেক পানি পাওয়ার ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয় দশ দিন অর্থাৎ ১১-২০ এপ্রিল ২৭,৬৩৩ কিউসেক পানি পাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এছাড়াও চুক্তি কালীন সময়ে অনুচ্ছেদ ১০ অনুসারে পর্যালোচনার পর প্রয়োজনীয় সাজুস বিধানের বিষয়ে পারস্পরিক ঐক্যমত্যের অভাব হলে ভারত ফারাক্কা ব্যারাজের নিচে অনুচ্ছেদ:২ এ বর্নিত সূত্র অনুসারে প্রাপ্য বাংলাদেশের ভাগের অন্যূন শতকরা ৯০ ভাগ পরিমান পানি, যতদিন পর্যন্ত না পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে প্রবাহ বন্টনের বিষয় গৃহীত না হয়, ততোদিন পর্যন্ত অবমুক্ত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সর্বপরি অনুচ্ছেদ- ৪ অনুসারে সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি টীম গঠন করা হবে এবং উক্ত টীম হার্ডিঞ্জ ব্রিজসহ ফারাক্কা, ফারাক্কার নিচে ফিডার ক্যানেলে ও নেভিগেশন লকে রেকর্ড করবে এবং স্ব- স্ব সরকারের নিকট তাদের রিপোর্ট পেশ করার বিধান রাখা হয়েছে। ১৯৯৬ সালের দীর্ঘমেয়াদী এ চুক্তির উল্লেখিত গুরুত্ব পূর্ন দিকগুলো বোঝার সুবিধার্থে চুক্তির পরিশিষ্ট- ১ ও পরিশিষ্ট-২ সারণী- ৫.১ ও ৫.২ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারণী - ৫.১

পরিশিষ্ট - ১

ফারাক্কায় পানির প্রাপ্যতা	ভারতের হিস্যা	বাংলাদেশের হিস্যা
৭০,০০০ কিউসেক বা তার কম।	৫০%	৫০%
৭০,০০০ ৭৫,০০০ কিউসেক	অবশিষ্টাংশ	৩৫,০০০ কিউসেক
৭৫,০০০ কিউসেক বা তার বেশী	৪০,০০০ কিউসেক	অবশিষ্টাংশ

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ৫.২ পরিশিষ্ট-২

(প্রতি বছর ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ মে'র মধ্যে ফারাক্কায় পানি বন্টন)

পানির গড় প্রবাহ ১৯৪৯-১৯৮৮ সালের মত হলে প্রত্যেক পক্ষের হিস্যা নিম্নরূপ

মেয়াদ কাল	গড় প্রবাহ (কিউসেক)	ভারতের হিস্যা (কিউসেক)	বাংলাদেশের হিস্যা (কিউসেক)
জানুয়ারী			
১---১০	১,০৭,৫১৬	৪০,০০০	৬৭,৫১৬
১১---২০	৯৭,৬৭৩	৪০,০০০	৫৭,৬৭৩
২১---৩১	৯০,১৫৪	৪০,০০০	৫০,১৫৪
ফেব্রুয়ারী			
১---১০	৮৬,৩২৩	৪০,০০০	৪৬,৩২৩
১১---২০	৮২,৮৫৯	৪০,০০০	৪২,৮৫৯
২১---২৮/২৯	৭৯,১০৬	৪০,০০০	৩৯,১০৬
মার্চ			
১---১০	৭৪,৪১৯	৩৯,৪১৯	৩৫,০০০
১১---২০	৬৮,৯৩১	৩৩,৯৩১	৩৫,০০০
২১---৩১	৬৪,৬৮৮	৩৫,০০০	২৯,৬৮৮
এপ্রিল			
১---১০	৬৩,১৮০	২৮,১৮০	৩৫,০০০
১১---২০	৬২,৬৩৩	৩৫,০০০	২৭,৬৩৩
২১---৩০	৬০,৯৯২	২৫,৯৯২	৩৫,০০০
মে			
১---১০	৬৭,৩৫১	৩৫,০০০	৩২,৩৫১
১১---২০	৭৩,৫৯০	৩৮,৫৯০	৩৫,০০০
২১---৩১	৮১,৮৫৪	৪০,০০০	৪১,৮৫৪

Dhaka University Institutional Repository

সারণীতে উল্লেখিত চিত্র মোতাবেক বাংলাদেশের জন্য সুবিধা জনক দিক গুলো নিম্নরুপঃ-

১। দীর্ঘ মেয়াদ

(ক) প্রথম বারের মত বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে একটি দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি করতে সক্ষম হয়েছে। যার মেয়াদ নির্ধারিত হয়েছে ৩০ বছর। এবং মেয়াদ শেষে পুনরায় পারস্পরিক আলোচনা সাপেক্ষে চুক্তিটি নবায়ন করা যাবে।

(খ) পূর্ববর্তী অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের চুক্তির মেয়াদ ছিল পাঁচ বছর ।

(গ) ১৯৮১ সালের সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ ছিল দুই বছর।

(ঘ) ১৯৮৫সালের সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ ছিল মাত্র তিন বছর।

এ দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় বাংলাদেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহন সহজতর হবে । এবং সাহায্য দাতা দেশ গুলো প্রকল্প সাহায্য প্রদানে অধিক আগ্রহ বা উৎসাহিত হবে।

২। প্রবাহ বৃদ্ধি

(ক) পানি বন্টন চুক্তি পূর্ববর্তী চুক্তির মত পানি প্রবাহ বৃদ্ধি সাপেক্ষ করা হয়নি।

(খ) প্রবাহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দু'দেশ কোন সমঝোতায় পৌছাতে না পারলেও পানি বন্টন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

(গ) চুক্তির মুখবন্ধে দু'-দেশের স্বার্থে প্রয়োজনীয় পানি প্রবাহ বৃদ্ধির অনুসন্ধানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৩। চুক্তি শূন্যতা ঘটতে না দেয়া

(ক) পাঁচ বছর পর যে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে উক্ত পর্যালোচনায় সমোঝোতা প্রতিষ্ঠা না হলেও পানি বন্টন চুক্তি চলমান থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) চুক্তি অনুসারে সমন্বয় সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনে বিলম্ব হলে ঐ সময় বাংলাদেশের প্রাপ্য পানির হার ৯০ ভাগের কম হবে না।

(গ) বিগত চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ন হবার পর পানি পাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে বাংলাদেশ ১৯৯৩ সালে ৯২১৮ কিউসেক পরিমান পানি পেয়েছে।

৪। পুর্বের তুলনায় উত্তম ব্যবস্থাপনা

(ক) বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি দুর্যোগ পূর্ন শুষ্ক মৌসুম হলো ১ মার্চ থেকে ১০ মে পর্যন্ত। এ সময় ১৯৭৭ সালের তুলনায় বাংলাদেশ বেশি পানি পাবে।

(খ) ১৯৭৭ সালের চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ পেত ১,৯৩,২২০ কিউসেক পানি। তৎস্থলে ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে বাংলদেশ পেয়েছে ২,০৭,৫৮২ কিউসেক অর্থাৎ এটা একদিকে ১৯৭৭ সাল এবং ১৯৮২ ও ১৯৮৫ সালের সমঝোতা স্মারকের চেয়ে বেশি।

(গ) এপ্রিলের তৃতীয় ১০ দিনে বাংলাদেশ নিশ্চিত ৩৫,০০০ কিউসেক পানি পাবে কিন্তু ১৯৭৭ সালের গ্যারান্টি ক্লজে ২৭,৬০০ কিউসেক পানি পাওয়ার নিশ্চয়তা ছিল।

(ঘ) প্রতি পাঁচ বছর পর পর পর্যালোচনা করায় যে সুযোগ ১৯৯৬ সালের চুক্তিতে রাখা হয়েছে তাতে উভয় দেশ তদের প্রাপ্তির হিসাব মিলিয়ে নিতে পারবে।

(ঙ) উভয় দেশ পানি বন্টন ব্যবস্থার প্রয়োজনে সমতা, স্বচ্ছতা ও পরস্পরকে ক্ষতি না করার নীতি মালার ভিত্তিতে অন্যান্য নদীর পানি বন্টন চুক্তি সম্পাদনের প্রতি ও গুরুত্ব আরোপ করেছে।

১৯৯৬ সালের পানিবন্টন চুক্তির গুরুত্বঃ-

১৯৯৬ সালের পানি বন্টন চুক্তি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ আলোচনায় এর কোন দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি সম্পাদন কবা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ যখন তার স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী পালনে প্রস্তুতি নিচ্ছিল তার প্রাক্কালে এ চুক্তি সম্পাদন সত্যিই রজত জয়ন্তীর আনন্দকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিল। সাথেই স্বাধীনতা যুদ্ধে ঐকান্তিক সাহায্যকারী প্রতিবেশী দেশ ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক এক

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক শুভ সূচনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। এবং সুযোগ এল দু'দেশের মধ্যকার অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান করার। ইহা দু'দেশের পারস্পরিক সুবিধা তথা এ অঞ্চলের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সমন্বয় সাধনের পথ সুগম করে দিয়েছে। চুক্তিটি ৩০ বছর মেয়াদী হওয়ায় এবং মেয়াদ শেষে নবায়নের সুযোগ থাকায় সমস্ত রকমের অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে।

এরকম একটি দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে কেবল মাত্র দু'দেশের রাজনৈতিক নেতাদের দূরদৃষ্টি, দৃঢ় প্রত্যয় এবং সর্ব প্রকার বিপত্তি মিটিয়ে ফেলার রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছিল বলে। এদিক দিয়ে বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, ব্যাপারটি ছিল সময়ের দাবি এবং অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ন।

১৯৯৬ সালের চুক্তি সম্পাদনের ফলে বাংলাদেশ সরকার দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহন করতে সক্ষম হবে। এবং জাতীয় উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প গ্রহন করতে পারবে। চুক্তি সম্পাদনের পর দাতা সংস্থা যেমন এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্ব ব্যাংক সহ অন্যান্য দাতা দেশ ইতোমধ্যেই প্রকল্প সাহায্য প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করছে।

এ চুক্তি বাংলাদেশ - ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক বলে চিহ্নিত করা যায়। কেননা ইহা রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি পূরণ ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতীক স্বরূপ, যার মাধ্যমে দু'দেশের সম্পর্কের এক গুয়েমি ভাবের অবসান ঘটে। ভারত এবং প্রতিবেশী ছোট ছোট দেশের মধ্যে সামঞ্জস্যের বিস্তার ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এ চুক্তি দক্ষিন এশিয়ার দেশ গুলোর জন্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির চিহ্ন বহন করে। ভারত যেন তার প্রতিবেশী দেশ গুলোর সাথে সমস্ত পার্থক্য ও বিভেদ ভুলে গিয়ে সৎ প্রতিবেশী সুলভ মানসিকতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে সাম্যের ধারায়।

১৯৯৬ সালের এ পানি বন্টন চুক্তি বাংলাদেশ ও ভারতকে তাদের মধ্যেকার দীর্ঘ দিনের বিভিন্ন সমস্যা মিটিয়ে ফেলার পরিবেশ

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি করেছে। ফলে দু'দেশ অন্যান্য অমীমাংশিত বিষয় গুলো গুছিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান ধারা গংগার পানি বন্টনকে কেন্দ্র করে অনেক সময় আবর্তিত হয়েছে। চুক্তির মাধ্যমে তার অবসান ঘটেছে। তাছাড়া বাংলাদেশের জন্য এ চুক্তি কেবল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই নয় আর্থ- সামাজিক প্রেক্ষিতেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে[১১]।

যেহেতু এ চুক্তির মধ্যদিয়ে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, সেহেতু দু'দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত অন্যান্য যৌথ নদীর পানি বন্টনের যে সকল সমস্যা রয়েছে তা সমাধানে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহন করা সম্ভব হবে।

এই চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে ভারত গংগার সবটুকো জল আত্মসাৎ করে চলছিল এবং পূর্ববর্তী সরকার গুলো জাতিসংঘ সহ নানা সংস্থার মাধ্যেমে এর সমাধানের চেষ্টা করে, কিন্তু কোনক্রমেই ভারত তার অপসিদ্ধান্ত বাতিল করেনি। দীর্ঘ মেয়াদী এই চুক্তি সম্পাদনের ফলে অন্তত: ভারত একতরফা ভাবে গংগার সবটুকো পানি প্রত্যাহার করতে পারবেনা[১২]।

একটি দীর্ঘ মেয়াদী সমাধানের জন্য দু'দেশ একশত পনেরটি বৈঠক করে চুক্তিতে উপনীত হয়েছে। পানি প্রবাহ বৃদ্ধি সংক্রান্ত অজুহাত বাদ দিয়ে চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সত্যিই তাৎপর্য বহ।

দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তির বিপক্ষে অভিমতঃ-

বিগত ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ নয়াদিল্লীতে দু'দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে এই ঐতিহাসিক চুক্তি। গংগার পানির ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অধিকার পুনরুদ্ধার এবং নিশ্চিত করা হয়েছে এর মাধ্যমে। চুক্তিতে ফরাক্কা বাঁধ তৈরীর প্রেক্ষিত, বাংলাদেশ এবং ভারত কি পরিমানে পানি পাবে, পানি প্রবাহের পরিমান ও পর্যবেক্ষন, চুক্তির গ্যারান্টি বা মেনে চলার নিশ্চয়তা এবং চুক্তির মেয়াদ সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে সন্নিবেশিত হলেও গংগা চুক্তির বেলা

১১. *Ibid*, P- 233.
১২. *দৈনিক আজকের কাগজ*, ঢাকা, ১২ জানুয়ারী, ১৯৯৯, পৃ ৪।

Dhaka University Institutional Repository

যে বিষয়টি প্রথম থেকে অনুচ্চারিত থেকে গেছে সেটা হলো আন্তর্জাতিক একটি নদীর উপর কোন একটি দেশের বাঁধ তোলার ব্যাপার। পৃথিবীতে একটি আন্তর্জাতিক নদীর উপরে উজানের কোন দেশ বাঁধ দিয়েছে তার দৃষ্টান্ত নেই। সমুদ্রে পড়ার আগে ভাটির দেশ আন্তর্জাতিক একটি নদীর উপর বাঁধ দিতে পারে যেহেতু উজানের দেশগুলো তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ভাটির দেশগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হয় বলেই উজানের দেশগুলো আন্তর্জাতিক কোন নদীর উপর বাঁধ দিতে পারে না। কিন্তু ভারত আন্তর্জাতিক এই নিয়ম ভঙ্গ করে গংগার উপর এবং বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ভারত থেকে বয়ে আসা সকল নদীর উপর বাঁধ বসিয়ে একতরফা ভাবে পানি নিজের কাজে ব্যবহার করে যাচ্ছিল যা সম্পূর্ন ভাবে নীতি বিগর্হিত। এটা হল জল ছিনতাই বা হাইজ্যাকের দৃষ্টান্ত যা অপরাধ মূলক। চুক্তি করে ভারত বাংলাদেশকে যে পানি দিচ্ছে তা মোটেও কোন মহানুভবতার ব্যাপার নয়[১৩]।

আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতি অগ্রাহ্য করে ভারতের বাঁধ দিতে দ্বিধা না করার হেতু হলো, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের দরিদ্র সীমার নিচে অবস্থান এবং এর শাসকদের দুর্নীতিতে আপদামস্তক তলিয়ে থাকা। দরিদ্র-নিরক্ষর ও বন্ধুহীন এমন একটি দেশের ভাগ্য এর চেয়ে ভিন্ন হতে পারে না। ভারতের মত একটি বিশাল দেশের শাসকদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ করুনার পাত্রের বেশী কখনো নয়[১৪]।

"*গংগার পানি বন্টন*" শীর্ষক শত নাগরিক কমিটির সেমিনারে বলা হয় যে, ১২ ডিসেম্বর চুক্তিতে বাংলাদেশের পানি প্রাপ্তির বিষয়টি ভারতের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এটি একটি অসম চুক্তি, বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থি। এ চুক্তি বলে আন্তর্জাতিক নদী গংগাকে ভারতের নদী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এছাড়া যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলো ভারত সেটি এতদিন সম্পাদন করতে আগ্রহী হয়নি কেন আর কেনই বা ভারত এত আগ্রহ ভরে এগিয়ে এসেছে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ ব্যাপার। কেননা ১৯৭৭ সালে ভারত গংগার পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল আন্তর্জাতিক চাপের মুখে[১৫]।

১৩. দৈনিক আজকের কাগজ, ঢাকা, ১২ জানুয়ারী, ১৯৯৭, পৃ ৪।
১৪. ঐ
১৫. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ০১ জানুয়ারী, ১৯৯৯, পৃ ০১, ২৩।

Dhaka University Institutional Repository

আরও লক্ষ্যনীয় যে, ভারত বরাবরই গংগার পানি প্রবাহ বৃদ্ধির দোহাই পেরেছে বাংলাদেশের কাছে। উত্থাপন করেছে বাংলাদেশ ভূ-খন্ডের উপর দিয়ে গংগা- ব্রহ্মপুত্র লিংক ক্যানেলের শর্ত। ১২ ডিসেম্বর চুক্তি স্বাক্ষরের সময় এ সব প্রশ্ন আসেনি। ভারত স্বত:স্ফুর্ত হয়ে এগিয়ে এসেছে। এ ধরনের স্বত:স্ফুর্ততার পেছনের রহস্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে[১৬]।

সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপক সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক শাহজাহান বলেন, ৩০ বছর মেয়াদী ভারত বাংলাদেশ গংগার পানি বন্টন চুক্তিটি কোন পক্ষ চাইলে প্রথমে দু'বছর পর, রুটিন মাফিক ভাবে পাঁচ বছর পর অথবা প্রয়োজন হলে আরও আগে পর্যালোচনা ও সমন্বয় করা যাবে। ফারাক্কায় গংগার পানি ৫০ হাজার কিউসেকের কম হলে উভয় পক্ষ আশু আলোচনায় বসবে। কিন্তু আলোচনায় যদি ঐক্যমত্য না হয় তা হলে বাংলাদেশ তার জন্য নির্দিষ্ট শতকরা ৫০ ভাগের মধ্যে থেকে শতকরা ৯০ ভাগ পাবে (*১ জানুয়ারী থেকে ৩১মে পর্যন্ত*) অর্থাৎ ফারাক্কায় যে প্রবাহ থাকবে বাংলাদেশ তার ৫০ ভাগ না পেয়ে পাবে ৪৫ ভাগ। এসময়ে ভারত ৩৫,০০০ কিউসেক পানি সরিয়ে নিতে পারবে[১৭]।

অধ্যাপক শাহজাহান আরো বলেন, ১৯৭৭ সালের চুক্তি মোতাবেক ভারত ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ মে পর্যন্ত যে পরিমান পানি পেত, ১৯৯৬ সালের চুক্তি বলে ভারত এখন ঐ সময়ে তার চেয়ে অনেক বেশি পানি পাবে। বাংলাদেশ শুধু জানুয়ারী মাসে একটু বেশি পানি পাবে। এপ্রিল মাসে যেখানে পানি প্রয়োজন ৩১,৭৭৮ কিউসেক সেখানে '৯৬ এর চুক্তি বলে বাংলাদেশ পাবে গড়ে ৩২,৫৪৪ কিউসেক অর্থাৎ ঘাটতি হবে ২৯,২৩৪ কিউসেক। তিনি আরো বলেন, গংগার পানি প্রবাহ বৃদ্ধির বিকল্প কোন পথই নেই নেপালকে ছাড়া, যে সংকোশ নদী থেকে সংযোগ খালের মাধ্যমে প্রবাহ বৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে সেই সংকোশ ব্রহ্মপুত্রেরই শাখা নদী। সংকোশের পানি গংগায় নিয়ে আসা, এতে করে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় পানির টান পড়বে[১৮]।

সেমিনারে অপর প্রবন্ধ উপস্থাপক সাদেক খান বলেন, চুক্তিটিকে এক নজরে দেখা যায়, গংগার মূল প্রবাহের অধিকার আমরা ভারতের

১৬. *ঐ*
১৭. *ঐ*
১৮. *ঐ*

Dhaka University Institutional Repository

হাতে তুলে দিয়ে এলাম। চুক্তিটিকে ৩০ বছর মেয়াদী বলা হয়েছে। কার্যত: আমাদের জন্য এর মেয়াদ দুই বছর। ভারত অবশ্য মতান্তরের অজুহাতে আরও ২৮ বছরে আমাদের সাথে কথা না বলে চুক্তির আওতায় যথেচ্ছ পানি সরাতে পারবে। ফারাক্কায় আমাদের দিতে থাকবে ভারতের হিসেবে প্রবাহের ৪৫ শতাংশ সেটা যত কমই হোক না কেন। এ নিয়ে আমাদের সালিশী প্রার্থনারও অবকাশ কম। কারন ধমক দিয়ে সালিশের ধন্যবাদ করা হয়েছে। ১৯৭৭ সালের চুক্তিতে সালিশের অবকাশ রাখা হয়েছিল[১৯]।

সেমিনারে সভাপতির ভাষনে অধ্যাপক এমাজউদ্দীন বলেন, "ভারত চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছে তার নিজ স্বার্থকে উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করে, কোন ছাড় দিয়ে নয়"। চুক্তিটি স্বাক্ষর করা হয়েছে বাংলাদেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়ে। চুক্তিটি সম্পর্কে পানি ও নদী বিশেষজ্ঞ গন যে সব তথ্য ও উপাত্ত তুলে ধরেছেন তাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের যখন পানি প্রয়োজন হবে না তখন বন্যার তান্ডব বয়ে যাবে। আর যখন প্রয়োজন হবে তখন প্রয়োজনীয় পানি পাওয়া যাবে না। তিনি আরো বলেন, "এ ধরনের খারাপ চুক্তি, কোন চুক্তি না থাকার চেয়েও খারাপ। অর্থাৎ চুক্তি না থাকাটাও বরং ভাল"। তিনি আরো বলেন, লক্ষ্যনীয় যে, ভারতে যখন কোন স্থিতিশীল সরকার থাকে তখন ঐ সরকার গুলো তার প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে অবজ্ঞা পূর্ন আচরন করে থাকে। তিনি বলেন, ১৯৭৭ সালের পানি চুক্তিটি যখন স্বাক্ষরিত হয় তখন ভারতে ছিল অস্থিতিশীল জনতা সরকার, ১৯৯৬ সালের চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে ও ঐ একই ভাবে সেখানে প্রধান মন্ত্রী দেব গৌড়ের নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন রয়েছে বাম মধ্য ফ্রন্টের এমনই সরকার। কংগ্রেস ১৯৭৭ সালের চুক্তিটি কোন ভাবেই মেনে নিতে পারেনি। এ কারনেই চুক্তিটি পরবর্তীতে আর নবায়ন হতে পারেনি। ভারতের স্থিতিশীল সরকার কখনোই চায়নি প্রতিবেশীদেরকে সমান ভাবে বিবেচনা করতে[২০]।

৪ জানুয়ারী ১৯৯৯ প্রকাশিত দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় উপ-সম্পদকীয়তে বলা হয়েছে[২১]--

১। চুক্তি অসম, ত্রুটি পূর্ন এবং বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থি।

১৯. ঐ
২০. ঐ
২১. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ০৪ জানুয়ারী, ১৯৯৯, পৃ ৫।

Dhaka University Institutional Repository

২। চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের পানি প্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা নেই।

৩। শুষ্ক মৌসুমে ভারত পানি পাবে বেশি বাংলাদেশ পাবে কম।

৪। চুক্তিতে অরবিট্রেশনের কোন ব্যবস্থা নেই। সবকিছু নির্ভর করবে ভারতের সহযোগিতার উপর।

৫। চুক্তিতে কোন গ্যারান্টি ক্লজ নেই। '৭৭ সালের চুক্তিতে যে ধরনের গ্যারান্টি ক্লজ ছিল '৯৬ সালের চুক্তিতে তার বিপরীত ক্লজ।

৬। অগমেন্টেশনের জন্য নেপালকে রাখা হয়নি।

৭। চুক্তির অসমতা ও ত্রুটি নিরসনের উপায় খুঁজে বেড় করতে হবে।

৮। চুক্তি নিয়ে উল্লসিত হবার কিছু নেই।

গংগার প্রবাহ ফারাক্কায় মেপে ফারাক্কায় ভাগাভাগির মধ্যে ভারতের লাভ হলো, ফারাক্কা বাঁধ দেবার আগে চরম খরা মৌসুমেও বাংলাদেশের গংগা দিয়ে কম পক্ষে তিন লাখ কিউসেক পানি বয়ে যেত। ১৯৯৬ সালে গংগা চুক্তি আর ১৯৭৪ সালে একতরফা ভাবে ফারাক্কা চালু করায় পর ভারত তার হিমাচল, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, দিল্লী, উড়িষ্যা ও পশ্চিম বঙ্গকে এ ভরা নদীর সমুদয় পানি চুষে নেবার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করেছে। তারপর চুক্তি দিয়েছে এমন এক সময়, যখন গংগার এ দিকটা ফাঁকা[২২]।

ভাটি অঞ্চলের দেশ হিসাবে বাংলাদেশ গংগার প্রাকৃতিক প্রবাহের উপর তার হিস্যা পাবার কথা। কিন্তু '৯৬ এর ১২ ডিসেম্বর চুক্তি হয়েছে কোলকাতা বন্দরে পলি তাড়ানোর ফিডার ক্যানেলের পানি চাহিদার সাথে বাংলাদেশের সমগ্র চাহিদাকে তুলা দন্ডে মেপে। সেখানে এক রত্তি জিতেছেন সমর্থক-বিশেষজ্ঞরা। যেহেতু পশ্চিম বঙ্গ বলছে, তাদের ভাগে পানি কম পড়েছে, এটাই হচ্ছে এখানকার সমর্থকদের আনন্দ, দেখুন ভারত ঠকে গেছে। আসলে পশ্চিম বঙ্গও এখন দিল্লীর সাথে পানি নিয়ে দর কষাকষি করতে

২২. সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ঢাকা, ০৭ মার্চ, ১৯৯৭, পৃ- ৫।

Dhaka University Institutional Repository

পারছে। কিন্তু বাংলাদেশের এ সরকারের আর কিছু বলার নেই, পরবর্তীকালে কি ঘটবে কেউ জানে না[২৩]।

ভারতের অভ্যন্তরে কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্মদা নিয়ে রাজ্যে রাজ্যের পানি ভাগা ভাগির চুক্তি হয়েছে। কিন্তু গংগা নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে রাজ্যের অভিযোগ, উত্তর প্রদেশই ভাটির প্রবাহ লুট করে ভোগ করছে। রাজ্যটি ভারতের কংগ্রেসী ক্ষমতার ঘাঁটি[২৪]।

বাঁধ আসলে দু'টো। একটা গংগার উপর মালদহ জেলার ফারাক্কায়। আর একটা সীমান্তে গংগার প্রবাহ থেকে ভাগীরথীর মুখে জঙ্গীপুরে। জঙ্গীপুর বর্ষায় খোলা থাকে। অক্টোবরে জঙ্গীপুর বাঁধের মুখ শুকিয়ে যায়। তখন ফারাক্কা বাঁধ বন্ধ করে দিয়ে পানি উঁচিয়ে ফিডার ক্যানেল দিয়ে ৪০,০০০ কিউসেক পানি জঙ্গীপুরের বেশ নিচে এনে ভাগীরথীতে ফেলা হয় কোলকাতা বন্দর ফ্লাশ আউটের জন্য। চুক্তি সম্পাদন কালে ধরে নেয়া হয়েছে যে, ভারতের (ভাগীরথীর) চাহিদা ৪০,০০০ কিউসেক আর বাংলাদেশের চাহিদা (বড়জোর) ৫৫,০০০ কিউসেক। অর্থাৎ ১,০০০০০ কিউসেক পানি থাকলে কোন চিন্তার প্রয়োজন নেই। এর চেয়ে পানি যেহেতু মার্চ- এপ্রিল- মে মাসে নেমে যায় সেহেতু ৫০:৫০ অনুপাতে ভাগ করতে গিয়ে ৯'টি ১০ দিনের স্ল্যাবে পানি বন্টনের নামতা তৈরী হয়েছে। ২২/২৩ মার্চের কাছাকাছি ৫/৬ দিনের মধ্যে অমাবশ্যা/পুর্নিমায় বিরাট জোয়ার কোলকাতা বন্দরে পলি আসে। এ সময়টা ভাগীরথীর জন্য বেশি পানি নেবে ভারত পুরো ৪০ রেখে অবশিষ্ট বাংলাদেশ[২৫]।

বাংলাদেশ এখন যেটুকু পানি পাবে, তা থেকে ১৫,০০০ কিউসেক নদীর প্রবাহের জন্য রেখে ২৫,০০০ কিউসেক সেচ বা নাব্যতায় ব্যবহার করতে পারবে। এ ২৫,০০০ এর মধ্যে ১০,০০০ কিউসেক যাবে খুলনার নদীতে লোনার গ্রাস কমাতে। সেচের জন্য ১০,০০০ কিউসেক থাকবে।

একটি শ্যালো টিউবওয়েল প্রতি সেকেন্ডে ১৫ লিটার পানি তোলে। ১,২০০ শ্যালো টিউবওয়েলের পানি আসবে না এখন গংগা দিয়ে। লো-লিফট পাম্প প্রতি সেকেন্ডে ৬০ লিটার পানি তোলে। গংগা চুক্তির বদৌলতে মাত্র ৭৫০ লো-লিফট পাম্প চালানো যাবে সারা বাংলাদেশে। আর ভারত বিশাল রাজপুতনার রাজস্থান থেকে আজমীর পর্যন্ত মরুভূমি সবুজ করছে গংগার লাখ লাখ কিউসেক পানিতে[২৬]।

২৩. ঐ
২৪. ঐ
২৫. **সাপ্তাহিক সোনার বাংলা**, ঢাকা, ০৭ মার্চ, ১৯৯৭, পৃ ০৫।
২৬. ঐ

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৬

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও পরিবেশের উপর ফারাক্কা বাঁধ ও পানি বন্টন চুক্তির প্রভাব।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ফারাক্কা বাঁধ ও পানি বন্টন চুক্তির প্রভাবঃ-

বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও পুনঃ গঠনের কর্মসূচী স্বাভাবিক হয়ে আসলে দেশের জনগনের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় ভারত কর্তৃক ফারাক্কায় একতরফা ভাবে পানি প্রত্যাহারের দিকে। কেননা পানি প্রত্যাহারের ফলে জন জীবনের বিভিন্ন সেক্টরে তার প্রভাব পড়ে। ফলে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বিষয়টি জাতীয় ইস্যুতে পরিনত হয়। দেশের সর্বস্তরের জনগন ভারতের এক তরফা ভাবে পানি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে এবং স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় রাখার দাবি জানায়[২৭]।

১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশন তীব্র প্রতিবাদের মাধ্যমে অভিমত প্রকাশ করে যে, ভারত আন্তর্জাতিক নদী আইন অমান্য করে এক তরফা ভাবে গংগার পানি প্রত্যাহার করায় বাংলাদেশের অর্থনীতি চরম হুমকির সম্মুখীন। এরই সূত্র ধরে বাংলাদেশের জিলা ও বিভাগীয় আইনজীবি সমিতি সারা দেশে প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করে। বাংলাদেশ ফেডারেল ইউনিয়ন সাংবাদিকগন পানি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে তাদের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি সরকারকে বিষয়টি জাতিসংঘ সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপনের পরামর্শ প্রদান করে। এ ছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের অন্যান্য শিক্ষক সমিতিও বিষয়টি সম্পর্কে তাদের উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে[২৮]।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ বিষয়টি রাজনৈতিক আন্দলনের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে এবং সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাশ

২৭. **Begum Khurshida**, "*Tension over the Farakka Barrage*,"(U P L, Dhaka, 1987), P- 166.
২৮. *Ibid- P-167.*

Dhaka University Institutional Repository

বর্জন করে তীব্র আন্দলনে গোটা দেশ উত্তপ্ত করে তোলে। সাথেই তারা বিভিন্ন সেক্টর যেমন- অর্থনীতি, নৌ-চলাচল, কৃষি ও মৎস প্রভৃতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার চিত্র জন সমক্ষে তুলে ধরে। ফরাক্কা সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া দেশের বরেন্য রাজনীতিকগন ও পেশজীবি শ্রেনী যৌথ ভাবে ভারত কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীর বিরুদ্ধে তাদের বিবৃতি প্রদান করে। এক বিবৃতিতে বিচারপতি আবু সাইয়েদ চৌধুরী ২৬ মার্চ ১৯৭৬ লন্ডনে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, "*ভারত সম্পূর্ন আপোস বিরোধী মনোভাবের পদক্ষেপ গ্রহন করেছে, তবে আমি নিশ্চিত যে, তাদের পদক্ষেপ ব্যর্থ হবে, ভারতের বোঝা উচিৎ যে, তাঁদের বিবেক বর্জিত পদক্ষেপ ৮০ মিলিয়ন বাংলাদেশী ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রতিহত করবে*"। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্ধ সরকারকে ভারতের দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি ভঙ্গ এবং আন্তর্জাতিক নদী আইন অমান্য করার বিষয়ে তৃতীয় বিশ্ব সহ সারা বিশ্বে ভারতের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপনের আবেদন জানান[২৯]।

ভারতীয় কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ও ঐতিহাসিক লংমার্চ পদক্ষেপ গ্রহন করেন মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭৬ সালের ১৬ মার্চ লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী লংমার্চে অংশ গ্রহন করে। গংগার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের জন্য ইহা ছিল নি:শব্দ ও অহিংস আন্দোলন। মাওলানা সাহেবের নির্দেশে লংমার্চ সীমান্ত অতিক্রম করেনি, কেননা ভারত তার সীমান্তে প্রচুর সীমান্ত রক্ষী বাহিনী মোতায়ন করেছিল। মাওলানার এ আন্দোলন এত স্বত:স্ফূর্ত ছিল যে, সর্বস্তরের জনগন ব্যক্তিগত ভাবে চাল, ডাল, প্লেট ও বেডিং পত্র নিয়ে এ লংমার্চে অংশ নিয়েছিল। মাওলানার বক্তব্য অনুসারে- ভারত নির্মিত মিলিয়ন ডলারের প্রকল্প ধ্বংস করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা সম্পর্কে গোটা জাতিকে সচেতন করে তোলা[৩০]।

লংমার্চ কর্মসূচী গ্রহনের পূর্বে মাওলানা ভাসানী ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দ্রিরা গান্ধীর নিকট ব্যক্তিগত পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তির আবেদন জানান। মাওলানার পত্রের জবাবে শ্রীমতি

২৯. *Ibid.*
৩০. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

গান্ধী জানান যে, ১৫৬ কোটি রুপী ব্যয়ে ফারাক্কা বাঁধ নির্মানের পশ্চাতে মূল কারন হলো কোলকাতা পোর্টে নাব্যতা রক্ষা। মাওলানা এর জবাবে বলেন যে, ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত সংকট জনক হয়ে পড়েছে। তিনি শ্রীমতি গান্ধীকে বাংলাদেশের দুরাবস্থা স্ব-চক্ষে দেখার জন্য বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রন জানান[৩১]।

বাংলাদেশের জনগন তথা বিশ্ব জনগনের অভিমত হল ভারত ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার করেছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারনে। ভারত একতরফা ভাবে পানি প্রত্যাহারের অধিকার লাভ করে ১৯৭৫ সালের এডহক চুক্তির মেয়াদ শেষে শেখ মুজিবের জীবদ্দশায়। হঠাৎ শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহার সহজ হয়ে যায়। এবং ভারত একতারফা পানি প্রত্যাহারের কারন হিসেবে বিশ্ববাসীকে জানায় যে, বাংলাদেশের অসহযোগিতা মূলক মানসিকতার জন্যই ভারত একতরফা ভাবে পানি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে[৩২]।

পানি প্রত্যাহার সংকট নিরসনের জন্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও অ-রাজনৈতিক এলিটগন পারস্পরিক আলোচনা টেবিলে বসার আমন্ত্রন জানান[৩৩]। যাতে সমস্যার একটি সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছা সম্ভব হয়। অসংখ্য বার ঢাকা ও দিল্লীতে আলোচনা টেবিলে বসা সত্বেও ভারতের নেতিবাচক নীতির কারনে আলোচনা বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক বিতর্কের ক্ষেত্রে ফারাক্কা বিতর্ক একটি গুরুত্ব পূর্ন ভূমিকা পালন করে আসছে। ফারাক্কা বাঁধ মরন ফাঁদের মত কেবল মাত্র এ দেশের অর্থনীতি ও পরিবেশকেই প্রভাবিত করছে না, ইহা এ দেশের রাজনীতিকে করে তুলেছে অ-স্থিতিশীল। এ দেশের মিলিয়ন একর জমি পানির অভাবে তার উর্বরা শক্তি হারিয়ে ফেলায় হাজার হাজার মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে। কৃষি, শিল্প, নৌ-চলাচল ও মৎস আহরন সহ অসংখ্য পেশাজীবি ফারাক্কার প্রভাবে জীবন যুদ্ধে হেরে গেছে বা বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন টুকু হারিয়েছে। খাদ্য ঘাটতি, দাম বৃদ্ধি, মুদ্রা স্ফীতি ও বেকার সমস্যা এ সমস্যার সাথে যেন একাকার হয়ে আন্দোলন মুখর হয়েছে। বন্যা অতি বৃষ্টি দিন দিন এ

৩১. *Ibid.- P- 165.*
৩২. *Ibid- P- 169*
৩৩. *Ibid*

Dhaka University Institutional Repository

দেশের মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলছে এবং গৃহহীন হচ্ছে হাজার হাজার গ্রামবাসী। জীবন ও জীবিকার তাগিদে তারা ছুটে আসছে রাজধানী সহ বিভিন্ন জিলা শহরে। একমাত্র ঢাকা সিটিতে বর্তমানে ৭.৫ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী বাসবাস করে অত্যন্ত ঘিঞ্জি ও নোংরা শহরে পরিনত করেছে। ক্রমবর্ধমান এ জনসংখ্যা বাড়তি চাঁপ সৃষ্টি করছে। ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও চাকুরী সংকট প্রকট হচ্ছে। সাথেই অত্যাচার-অবিচার ও দুর্নীতি গোটা শহরকে বিষিয়ে তুলেছে যা উন্নয়ন কার্যক্রমকে চরম ভাবে ব্যাহত করছে। সব মিলিয়ে গোটা রাজধানী হয়ে উঠেছে অ-স্থিতিশীল[৩৪]।

একটা দেশের অ-স্থিতিশীল পরিবেশ ও পরিস্থিতির দায়ভার গ্রহন করতে হয় সেদেশের সরকার তথা প্রশাসন যন্ত্রকে। প্রশাসন যন্ত্র বা সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে ব্যর্থ হলে সঙ্গত কারনেই জনগন ঐ সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাধ্য হয়ে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সরকার তাদের ব্যর্থতার কারন ব্যাখ্যা করেন এবং ফারাক্কার প্রভাব জনগনকে অবহিত করলে জনগন ভারত বিদ্বেষী হয়ে উঠে।

ফারাক্কা বিতর্ক বাংলাদেশী জনগনকে যে ভারত বিরোধী হতে সাহায্য করেছে তা ইতোমধ্যেই প্রমানিত হয়েছে। কেননা বাংলাদেশীদের চোখে ভারত সৎ-বন্ধুসুলভ প্রতিবেশীর অবস্থান থেকে সরে পড়েছে এবং সময়ের পরীক্ষায় তাঁরা উত্তীর্ন হতে পারেনি। বাংলাদেশ ভারতের চিন্তা চেতনায় হতাশা বোধ করছে।

বাংলাদেশের জনগন স্বাধীনতার পর প্রথম দিকে অনুধাবন করেছিল যে, ভারত তার নিজেস্ব সুবিধার্থে বাংলাদেশকে *geo-politically* নিয়ন্ত্রন করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু ভারতের গাঢ় আলিঙ্গন বাংলাদেশের সবকিছুকে যেন একাকার করে ফেলেছিল। স্বাধীনতার অল্পকালের মধ্যে যখন দু'দেশের মধ্যে 'শান্তি চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয় তখন সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয় যে, ভারত একতরফা ভাবে ফারাক্কার পানি প্রত্যাহার করবে না। ১৯৭৫ সালে সমঝোতার মাধ্যমে বাঁধ চালু হলে পানি প্রাপ্তির সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বাংলাদেশ পাকিস্তানের প্রদেশ থাকাকালীন ফারাক্কা বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এ সময় ভারতের আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দিরা এটাকে নতুন দিল্লী ও ইসলামাবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ হিসেবে

34. **Islam Nahid**, "*The Ganges Water Dispute: Environmental and Related impacts on Bangladesh*", **BIISS Journal**, Vol- 12, No-3 July –1991. P.-288,289.

Dhaka University Institutional Repository

মনে করত। কিন্তু বাংলাদেশী জনগনের ভাগ্যের পরিহাস যে, ১৯৬০ সালে সিন্ধু পানি চুক্তির মাধ্যমে ভারত- পাকিস্তান একই রকম একটি সমস্যার ইতি টানছিল। অথচ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা সত্ত্বেও ভারত গংগা বিতর্ক সম্পর্কে বেমালুম নাছোর বান্দার ভূমিকা পালন করেছে[৩৫]।

উজানের দেশ হিসাবে ভারত- বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় পানি প্রদানের ক্ষেত্রে উদারতা না দেখিয়ে বরং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে পানি প্রত্যাহার করে বাংলাদেশের জনগনের মনে প্রতিনিয়ত হতাশা বৃদ্ধি করেছে যা ভারত সম্পর্কে তাদের বন্ধু সুলভ মানসিকতাকে পাল্টে দিয়েছি। এবং বাংলাদেশের জনগন ফারাক্কা বিতর্ক নিয়ে দেশের অভ্যন্তরে অসংখ্য বার পারস্পরিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেনী অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক জনসমর্থন সংগ্রহের জন্য জোরালো কণ্ঠে ফারাক্কা বিতর্ক তুলে ধরেছেন। এবং এ ফারাক্কা বিতর্ক বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের সরকার জনগনের অব্যাহত রাজনৈতিক চাপের মুখে থাকে কেননা জনগন সর্বদা এ বিতর্ক ও সমাধান সম্পর্কে জানতে চায়। কোন কোন রাজনৈতিক দল বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপনের মাধ্যমে সমাধানের জন্য সরকারকে চাপ প্রয়োগ করে। ১৯৭৭ সালে রাজনৈতিক দল ও জনগনের চাপের মুখে সরকার বিষয়টি জাতিসংঘের সাধারন পরিষদে উত্থাপন করলে চাপের মুখে ভারত ১৯৭৭ সালে প্রথম পাঁচ বছর মেয়াদী পানি বন্টন চুক্তি করতে সম্মত হয়। বিরোধী দলের অব্যাহত চাপের মুখে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার একটি সমাধানে পৌছায় রাজনৈতিক ভাবে বিরাট সাফল্য অর্জন করে। একদিকে অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক সাফল্য অন্য দিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র সমূহের রাজনৈতিক সমর্থনে সাফল্য লাভ করে[৩৬]।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে গংগার পানি বন্টন সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ন বিতর্ক। রাজনৈতিক দল সমূহ অর্থাৎ সরকারী ও বিরোধী দল উভই প্রতিপক্ষ ভারতের আপোস বিরোধী মনোভাবের নিন্দা করেছে। যেহেতু নদী কমিশনে পানি বিতর্ক নিয়ে নিয়মিত আলোচনা ঢাকা ও নতুন দিল্লীতে কোন অগ্রগতি ছাড়া বার বার মূলতবি হওয়ায় বিষয়টি

৩৫. **Iftekharuzzaman**, "*The Ganges Water Sharing issue: Diplomacy and domestic politics in Bangladesh*", **BIISS Journal**, Vol- 15, No-5 July -1994, P.-230.
৩৬. *Bangladesh Observer*, Dhaka, 8 October, 1983.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ও সংসদের বাইরে চরম বিতর্কের সৃষ্টি করে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ভারতের সমালোচনা করে এবং বাংলাদেশ সরকারকে তার দুর্বল পররাষ্ট্র নীতির ফলে পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে ব্যর্থতার সমালোচনা করে। ১৯৯৪ সালে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন বি, এন, পি ক্ষমতায় আসার তিন বছরের মধ্যেও পানি সমস্যা সম্পর্কে কোন সমাধানে পৌঁছতে না পারায় তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন সহ কঠোর সমালোচনা করেন। ১৯৭৫ সালে আওয়ামীলীগ সরকার সর্বাধিক পরিমান পানির হিস্যা আদায় করেছে বলে পূনরাবৃত্তি করেন। তিনি আরও বলেন, বেগম জিয়া এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ফারাক্কা প্রসঙ্গকে কাজে লাগিয়ে তার দলের সমর্থন আদায় করেছেন। এবং ফারাক্কা সমস্যা ভারতের ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়ে নির্বাচনে ফায়দা হাসিল করার চেষ্টা করেছে। ১৯৯১ সালে বি, এন, পি তার নির্বাচনী প্রচারনায় আওয়ামীলীগকে Pro- Indian দল বলে আখ্যায়িত করে নিজ দলের পক্ষে ভোট সংগ্রহ করার কাজ করেছে। এবং ফারাক্কাকে কেন্দ্র করে জনগন আওয়ামীলীগ বিরোধী ভোট দেয়ায় নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বি, এন, পি বিজয় লাভ করেছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে ভারত একতরফা ভাবে দীর্ঘদিন পানি প্রত্যাহার করায় বাংলাদেশের জনগন ভারত বিদ্বেষী হয়ে উঠেছে[৩৭]।

৩৭. **Iftekharuzzaman**, "*The Ganges Water Sharing issue: Diplomacy and domestic politics in Bangladesh*", **BIISS Journal**, Vol- 15, No-5 July –1994, P.-230.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও পরিবেশের উপর ফারাক্কার প্রভাব।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ একটি নদী মাতৃক দেশ। এখানে স্থল পথ থেকে নদী পথই যোগাযোগের তথা মালামাল পরিবহনের সব চেয়ে বেশি উপযোগী। এদেশের মানুষের জীবন, জীবিকা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নদীর সাথে সম্পৃক্ত। অন্যভাবে বলা যায় যে, নদীর উপর নির্ভর করে টিকে আছে নদী তীরের বিশাল জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশের দক্ষিন পশ্চিম অঞ্চল তুলনামূলক ভাবে শুস্ক। এ অঞ্চলের মানুষ সম্পূর্ন কিংবা আংশিকভাবে গংগার পানির উপর নির্ভর করে তাদের জীবন নির্বাহ করে থাকে। স্মরনাতীতকাল থেকে এ অঞ্চলের অর্থনীতি ও সমাজ জীবন গংগা নদীর অবদানে সম্মৃদ্ধি লাভ করেছে[১]।

বাংলাদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অঞ্চলের ৩৫ মিলিয়ন জনগন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে গংগা অববাহিকার উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করে থাকে। প্রকৃতির স্বাভাবিক অবদানে সমৃদ্ধ গংগা অববাহিকায় ফারাক্কা বাঁধের প্রভাবে মানুষের জীবন যাত্রা পাল্টে গিয়েছে এবং বাস্তুহারা করেছে অসংখ্য জনগোষ্ঠীকে। প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে জীবন যাপনকারী জনগনের নিকট ফারাক্কা বাঁধ প্রকৃতির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের সামিল। কেননা একতরফাভাবে গংগার পানি প্রত্যাহার বাংলাদেশের দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠীর দুঃখ কষ্টের প্রধান কারন হিসাবে চিহ্নিত। এ পানি প্রত্যাহারের ফলে ধ্বংস হচ্ছে নৌ- চলাচল ব্যবস্থা, মৎস সম্পদ, লবনাক্ততায় কৃষি জমি চাষের অযোগ্য হচ্ছে, শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং সর্বপরি নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত[২]।

১৯৭৫ সালের এডহক চুক্তির মেয়াদ শেষে ভারত একতরফাভাবে গংগার পানি তাদের স্বার্থে প্রত্যাহার করতে থাকে। ফলে বাংলাদেশ জীবন মরন সমস্যার মুখোমুখি হয়। এ সময় বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গংগার পানি বিতর্কের উপর শ্বেতপত্র প্রকাশ করে।

১. **Islam Rafiqul**, "*The Gages Water Dispute*",(U P L, Dhaka, 1987), P-36.
২. **Swain Ashok** "*The Environmental Trap*", Report No-44, 1995,(Uppsala University, Sweden), P- 64.

Dhaka University Institutional Repository

এ শ্বেত পত্রে বলা হয় যে, " ফারাক্কায় গংগার পানি ভারত কর্তৃক একতরফা ভাবে প্রত্যাহারের কারনে বাংলাদেশ গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। এই পানি প্রত্যাহারের পরিমান শুস্ক মৌসুমে গংগায় প্রবাহিত পানির চার এর তিন ভাগের চেয়ে বেশি। এরকম কঠিন নজির পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া দুস্কর যে, একটি আন্তর্জাতিক নদীর পানি কোন দেশ নিজ স্বার্থে তার প্রতিবেশী দেশকে বঞ্চিত করে বিপুল পরিমান প্রত্যাহার করে নেয়[৩]"।

এ শ্বেত পত্রের জবাবে ভারত " *দি ফারাক্কা ব্যারাজ* " শিরোনামে নিম্নোক্ত মন্তব্য পেশ করে----

" সচরাচর প্রাপ্ত টেকনিক্যাল ও অর্থনৈতিক তথ্য, পর্যবেক্ষন ও পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশে কোন প্রতিকুল অবস্থা সৃষ্টি করবে না। তবে " ***মাইনর প্রবলেম*** " হতে পারে। কিন্তু এটার সমাধান সহজেই সম্ভব যদি গংগার পানি অপসারনের প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হয় হুগলীতে[৪]"।

অবশেষে ভারত কতিপয় *"সামান্য সমস্যা দেখা দিতে পারে"* বলে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭৫ সালের এডহক চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ন হওয়ার পর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কোন চুক্তি না থাকায় এবং গংগার পানি প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে ভারত অভিমত প্রকাশ করে[৫]।

এই ফারাক্কা বাঁধ নির্মান ও পানি প্রত্যাহার কিভাবে এদেশের কৃষি, শিল্প, বন, মৎস সম্পদ, নৌ-চলাচল ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ করছে এবং সর্বপরি পরিবেশ দূষিত হচ্ছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

<u>কৃষির উপর প্রভাবঃ</u>

গংগার পানি অপসারনে সবচেয়ে মর্মান্তিক প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের কৃষি সম্পদের উপর। কৃষি কাজের জন্য উপযুক্ত সময় হল শুস্ক মৌসুম। এসময় পানির অভাবে কৃষিকাজ মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশের দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলের (*পুরো খুলনা বিভাগ ও রাজশাহীর দক্ষিনাঞ্চল*) সেচ ব্যবস্থা দারুনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং কৃষি জমি তার প্রয়োজনীয়

৩. **Begum Khurshida**, " *Tension Over the Farakka Barrage*" (UPL, Dhaka, 1987), P-130.
৪. *Ibid.*
৫. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

আদ্রতা হারায়। এক দিকে রবি শস্য উৎপাদন ব্যাহত হয় অন্য দিকে সেচের অভাবে অন্যান্য চাষাবাদ হয় বাধাগ্রস্থ। এছাড়া পানি প্রত্যাহারের ফলে রবি শস্য চাষ বিলম্বিত হওয়ায় পরবর্তী চাষের মৌসুম ও বিলম্বিত হয় এবং উৎপাদন মাত্রা অস্বাভাবিক হ্রাস পায়[৬]।

যদিও বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীর সবচেয়ে সহজলভ্য পানি অঞ্চলে। কিন্তু সীমান্তে হস্তক্ষেপের দরুন স্বল্প পরিমান জমি সেচের আওতায় এসেছে। বলা বাহুল্য যে, মাত্র ২৩ ভাগ চাষযোগ্য জমি সেচের আওতাধীন। গংগা কপোতাক্ষ প্রকল্প সহ বাংলাদেশের দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলে গংগা নদীর পানি প্রাপ্তিতে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়ায় কৃষকগন শুস্ক মৌসুমে সেচ প্রকল্প গ্রহন করতে পারছে না। *GK* প্রজেক্ট ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি থেকে দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলের ১,৪২,০০০ হেক্টর জমি জল সেচের আওতায় আনলেও ভারত কর্তৃক ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ১৯৯৩ সালের শুষ্ক মৌসুমে প্রকল্প এলাকার সকল প্রকার সেচ সুবিধা বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়[৭]। এবং পরবর্তী বছর গুলো অনুরূপ অবস্থা বিরাজ করে। *GK* প্রজেক্টের পরিচালকের ভাষ্য অনুযায়ী কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ এবং মাগুরা জিলার কৃষকরা শুস্ক মৌসুমে পানির অভাবে তাদের দ্বিতীয় শষ্য উৎপাদন করতে পারে না। *GK* প্রজেক্ট এলাকার ৩২৪ টি পানি ব্যবহার কারী সমিতি এমর্মে অভিযোগ করলে পরিচালক বলেন যে, এটা হচ্ছে ফারাক্কার প্রভাব[৮]।

The Environmental Trap বইর লেখক ***Ashok Swain*** ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে বাস্তব অবস্থা সরেজমীনে দেখার জন্য কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা এবং ঝিনাইদহ জিলায় গিয়ে সমিতির সদস্যদের সাথে কথা বলে জানেন এবং দেখেন যে, ফারাক্কা সম্পর্কিত তাদের অভিযোগ সত্য। একই সময় তিনি নিশ্চিত হন যে, অসংখ্য গ্রামবাসী যারা কৃষি নির্ভর জীবন যাপন করছিল তারা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে[৯]।

৬. **Swain Ashok** "*The Environmental Trap*" Report No- 44, 1995,(Uppsala University, Sweden), P- 63.
৭. *The Bangladesh Observer*, Dhaka, 30 March, 1993.
৮. **Swain Ashok** "*The Environmental Trap*", Report No- 44, 1995,(Uppsala University, Sweden) ,P- 64.
৯. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

ভারত থেকে কোন প্রতিশ্রুত পানি সরবরাহের অভাবে বাংলাদেশের সেচ প্রকল্প সমূহ ব্যাহত হচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রস্তাবিত গংগা ব্যারাজের কথা উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৯৩ সালের রিপোর্ট অনুসারে এলাকাটি প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। বিশেষ করে সেচ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, আদ্রতা হ্রাস এবং লবনাক্ততা ক্রমশ বেড়ে গিয়ে প্রায় ৪ (চার) মিলিয়ন একর ভূমি চাষের অযোগ্য করে তুলেছে। মাটির আদ্রতার অভাবে খুলনা অঞ্চলে কারিফ- ১ এর শস্য উৎপাদন বিলম্বিত হয়, হ্রাস পায় এবং ফসল কাটায় ও গোলাজাত করতে বিলম্ব ঘটে। সাথেই জুলাই আগষ্ট মাসে বন্যার প্রকোপে নিম্নাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারিফ- ১ এর ফসল বা প্রাথমিক শস্য উৎপাদনে ও গোলাজাত করনে বিলম্ব হওয়ার ফলে কারিফ- ২ (মুল ফসল) চাষে বিলম্ব ঘটে কখনো কখনো ***Trans Plantation*** অসম্ভব হয়ে পরে বন্যার কারনে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষনায় বলা হয় মাটির আদ্রতা হ্রাসের কারনে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় কৃষি বিভাগ। বিলম্ব চাষাবাদ এবং লবনাক্ততা বৃদ্ধির ফলে ১৯৯১ সালে বাংলাদেশের ৬২৫ (ছয়শ পঁচিশ) মার্কিন ডলারের সম পরিমান ক্ষতি হয়[১০]।

ফারাক্কায় গংগার পানি প্রত্যাহারের কারনে উক্ত অভাব পূরনের জন্য বাংলাদেশের খুলনা অঞ্চল সহ অন্যান্য অঞ্চলে শ্যালো টিউবওয়েলের ব্যবহার সাম্প্রতিক বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নে (সারণী-৬.১) এ এ বৃদ্ধি দেখানো হল[১১]।

সারণী-৬.১ বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগে শ্যালো টিউবওয়েলের সংখ্যা।

বিভাগ	সন ও সংখ্যা ১৯৮১-৮২	সন ও সংখ্যা ১৯৮৯-৯০	প্রতি বছর বৃদ্ধি
চট্টগ্রাম	২,৫০১	৫,১০৫	১৩.০১%
ঢাকা	১৩,৬৭৩	৩৪,৩৪৭	১৮.৯০%
খুলনা	২,৮০৮	১১,০৯৫	৩৬.৮৯%
রাজশাহী	২৩,৮৬১	৩৮,২০০	০৭.৫১%

১০. *Ibid, P-65.*
১১. *Ibid, P.P-65, 66.*

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত সারণীর তথ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, উপরিভাগের পানির অভাব পূরনের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। খুলনা অঞ্চলে শ্যালো টিউবওয়েলের সংখ্যা ঢাকা ও রাজশাহী অঞ্চলের চেয়ে কম। কারন দক্ষিন পশ্চিম অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানি প্রাপ্তির পরিমান মাত্র ১৯৫৮ মিলিয়ন কিউবিক মিটার এবং গোটা দেশ ৪৫,৭৩৮ মিলিয়ন কিউবিক মিটার পানির অধিকারী[১২]। অন্য দিকে নদীর পানি হ্রাসের কারনে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দক্ষিন পূর্বাঞ্চলে নিম্নে নেমে গিয়েছে ফলে টিউবওয়েল অচল হয়ে পড়েছে। এভাবে পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ায় এ অঞ্চলের ৩০ ভাগ শ্যালো টিবওয়েল ব্যবহার করা যাচ্ছে না[১৩]। ঝিনাইদহ শহরের এক শ্যালো টিউবওয়েলের দোকানদারের বর্ননা মতে, "দশ বছর পূর্বে এ অঞ্চলে শ্যালো টিউবওয়েল ৯০ ফুট পাইপ হলে পানি তুলতে পারতো, কিন্তু বর্তমানে শ্যালো টিউবওয়েল পানি তুলতে প্রয়োজন ১৬০ ফুট পাইপ। যা কৃষকদের নিকট একটি অতিরিক্ত বোঝা স্বরূপ। এ অবস্থা চলতে থাকলে এবং আরও হ্রাস পেলে শ্যালো টিউবওয়েল বিক্রি বন্ধ করে দেব এবং একমাত্র গভীর নলকূপ ব্যবহারের পরামর্শ দেব"। কিন্তু গভীর নলকূপের পানি প্রাপ্তির তুলনায় ইহার মূল্য পড়বে অনেক গুন বেশি। ফলে দক্ষিন পশ্চিম অঞ্চলে গভীর নলকূপও প্রকৃত বিকল্প নয়। এমন কি এ অঞ্চলের উঁচু অংশে গভীর নলকূপও অচল হয়ে পড়বে কারন ভূগর্ভস্থ পানির স্তর মারাত্মক ভাবে হ্রাস পাচ্ছে[১৪]।

কৃষি উৎপাদন হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন বিষয়। ভারত কর্তৃক ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে পানি অপসারনের পূর্বে বাংলাদেশের জনশক্তির ৭৫ ভাগ কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে দেশের ৫৬ ভাগ জি,ডি,পি অর্জন করত। এর মধ্যে ৩০ ভাগ *জি,ডি,পি* অর্জিত হতো ধান উৎপাদন থেকে। বাকি অংশ আসত যেমন গম, ডাল, তৈলবীজ, আখ এবং শাক-সবজি থেকে। এছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার ৭৭ ভাগ আসত পাট ও পাট জাত দ্রব্য এবং চা, তামাক ও তুলা রপ্তানি করে[১৫]।

384672

১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশিত শ্বেত পত্রে দাবি করা হয় যে, পানি প্রত্যাহারের ফলে ২,৩৬,০০০ টণ ধান কম উৎপাদিত হয়েছে। বাংলাদেশ আরো দাবি করে যে, পানি প্রত্যাহারে কৃষি

১২. *Ibid, P-65.*
১৩. *The Daily Star*, Dhaka, 11 Dec, 1993.
১৪. **Swain Ashok**, "*The Environmental Trap*", Report-No-44, 1995,(Uppsala University, Sweden) P-65.
১৫. **Crow Ben**, "*Sluring The Ganges*",(U P L, Dhaka, 1997),P-149.

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদনে তিন রকমের ক্ষতি সাধিত হয়েছে, প্রথমত: নদীর পানি হ্রাস পাওয়ায় ভূমির আদ্রতা হ্রাস পেয়েছে এবং এর ফলে উৎপাদন কম হয়েছে। দ্বিতীয়ত: নদীর পানিতে লবনাক্ততা বেড়ে যায় এবং উক্ত লবনাক্ত পানি সেচ কার্যে ব্যবহৃত হওয়ায় শষ্য উৎপাদন সম্পূর্ন বিনষ্ট হয়। শেষত: বাংলাদেশের কৃষকেরা উপলব্ধি করে যে, লবনাক্ততা বৃদ্ধি ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস হলে দেরিতে চাষ করলে ভাল হবে। কিন্তু এই দেরিতে চাষ করায় স্বল্প সময়ে গাছ পরিপক্ক হতে না পারায় উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়[১৬]।

বাংলাদেশের এ শ্বেত পত্রের জবাবে ভারত দাবি করে যে, বাংলাদেশের অভিযোগ সমর্থন যোগ্য নয়। কারন ১. ভূমির আদ্রতা বর্ষার উপর নির্ভরশীল, ভূগর্ভস্থ পানির প্রভাবে নয়। ২. পদ্মা নদী লবনাক্ততা দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। ৩. ফারাক্কা প্রভাবিত ভারতীয় অংশে এরকম কোন প্রতিকূল প্রভাব পড়েনি। ৪. ভারতীয় বিশেষজ্ঞ যারা পর্যবেক্ষনে গিয়েছেন তারা কেউ সেচ ব্যবস্থায় সমস্যা দেখতে পাননি।

লবনাক্ততা বৃদ্ধি

বাংলাদেশের মতে, ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলে নদীর পানিতে সমুদ্রের লোনা পানির অনুপ্রবেশে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে। বাংলাদেশের অভিযোগ সমূহের মধ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ন অভিযোগ। এ লবনাক্ততা আংশিক ভাবে কৃষি উৎপাদনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে, শিল্প উৎপাদন ব্যাহত করছে এবং বন সম্পদ নষ্ট করছে[১৭]।

সমুদ্রের লোনা পানি নদীর মিষ্টি পানিতে জোয়ার ভাটার মাধ্যমে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করে নদীতে প্রবেশ করে। যেখানে জোয়ার ভাটার মাত্রা কম সেখানেও লোনা পানির ঘনত্বের কারনে উজানের অংশে প্রবেশ করে। লোনা পানি প্রবেশের সংগে সংগে দ্রুত প্রয়োজন স্বাদু পানি ভাটির দিকে প্রবাহিত হওয়া যা জোয়ারের পানির শক্তিকে সহজে প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু যদি তা না হয় তবে লবনাক্ততা বৃদ্ধি পায়[১৮]।

১৬. *Ibid.*
১৭. *Ibid.*
১৮. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

অতীতে বঙ্গোপসাগর থেকে লোনা পানি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে গংগা ও তার শাখা নদীর প্রচুর মিষ্টি পানি লোনা পানিকে অপসারন করতে পারত। কিন্তু শুস্ক মৌসুমে গংগার পানি প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় বঙ্গোপসাগরের লোনা পানি প্রবেশ করে বাংলাদেশের দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলে মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করছে। ১৯৭৬ সালের অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, লোনা পানির অনুপ্রবেশ ও দীর্ঘ সুত্রিতা হ্রাস করার জন্য বাংলাদেশের দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে দেশের মধ্যাঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চল থেকে গংগার উপ-নদী গৌরি-মধুমতির উপর নির্ভর করত[১৯]। কিন্তু শুস্ক মৌসুমে গংগার প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় শাখা নদী গৌরি- মধুমতি তার সরবরাহের পরিমান হারায়। ফলে পানির লবনাক্ততা টাইডাল লিমিট ছাড়িয়ে পূনরায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং মারাত্মক সংকট সৃষ্টি করে। ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহারের পূর্বে লোনা পানি সাধারনত বাংলাদেশের ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল কিন্তু পরে যখন পানি প্রত্যাহার করা হয় তখন তা ৪৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রিপোর্ট অনুসারে খুলনা অঞ্চলে নদীর পানির লবনাক্ততা মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহারের পূর্বে স্বাভাবিক লবনাক্ততার মাত্রা ছিল ১৮০০ *Micro- MHOS/CM.* সেখানে ১৯৯৩ সালের এপ্রিলে বেড়ে দাড়ায় ৪০,০০০ *Micro- MHOS/CM.* নিম্নোক্ত সারণী-৬.২ এ ১৯৭৯ সালে স্বল্প মেয়াদী চুক্তির সময় এবং ১৯৮৯ সালে কোন চুক্তি না থাকার সময় লবনাক্ততা বৃদ্ধির মাত্রা দেখানো হলো[২০]।

সারণী-৬.২

লবনাক্ততার সর্বচ্চ মাত্রা বাংলাদেশের ক'টি নির্দিষ্ট স্থানে

জল বিদ্যুৎ পরিবাহিতা *Micro- MHOS.*

স্থান	১৯৭৯ সন	১৯৮৯সন
খুলনা	৬,০০০	২৮,০০০
চালনা	২৫,০০০	৩২,০০০
মোংলা	১৫,২০০	২৮,০০০
নলিয়ানালা	২৫,০০০	৪০,০০০

১৯. **Swain Ashok**, *"The Environmental Trap"*. Report NO-44, 1995,(Uppsala University, Sweden) P-66.
২০. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলে গংগার শাখা নদী ভৈরব এর তীরে অবস্থিত নদী বন্দর ও শিল্প নগরী। এখানে মিষ্টি পানির প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় সমুদ্র থেকে আসা পানি লবনাক্ততার মাত্রা সীমাহীন ভাবে বাড়িয়ে তুলেছে। উল্লেখিত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ক্রমশ লবনাক্ততার মাত্রা ভয়াবহ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং কৃষি, অভ্যন্তরীন জল সরবরাহ, বন সম্পদ ও শিল্প উন্নয়নে মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে[২১]।

বন সম্পদের উপর প্রভাব

বন সম্পদ থেকে বাংলাদেশের *জি, ডি, পি*'র ৫% ভাগ অর্জিত হয়ে থাকে। কাঠ দিয়ে গৃহ ও গৃহসামগ্রী, নৌকা, নিউজপ্রিন্ট এবং ম্যাচ তৈরী হয়ে থাকে। দেশের দক্ষিন পশ্চিম অঞ্চলের সুন্দরবন থেকে বেশির ভাগ কাঠ সংগৃহীত হয়ে থাকে। এ সুন্দর বনের বিখ্যাত সুন্দরী কাঠ কোমল লোনা পানিতে ভাল হয়। কিন্তু ফারাক্কা বাঁধের ফলে লবনাক্ততার মাত্রা অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় সুন্দরবন মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন।[২২]

The Environmental Trap বইর লেখক ***Ashok Swain*** ফারাক্কার প্রভাবে সুন্দরবনের প্রতিকূল অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য খুলনা, পিরোজপুর ও বাগের হাট অঞ্চলে যান এবং গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে এর ক্ষতির সত্যতা যাচাই করেন। তাঁর মতে, লবনাক্ততা বৃদ্ধি এবং সুন্দরবনে ঐ পানি প্রবেশ করায় এক দিকে মৃত্তিকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সুন্দরবনের গাছগুলো অপুষ্টিতে ভুগছে সাথেই বিপুল পরিমান সুন্দরী গাছ মারা যাচ্ছে। অথচ সুন্দরী গাছই হচ্ছে সুন্দরবনের প্রাণ এবং সবচেয়ে মূল্যবান কাঠ। বাংলাদেশের কাঠ চাহিদার ৬৫% ভাগ যোগান দিয়ে থাকে এ সুন্দরবন। সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিন পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট। যার জমির পরিমান ৫,৭১,৫০৮ হেক্টর[২৩]। এক অনুসন্ধান জরিপে দেখা যায় যে, ৪০ থেকে ৫০ ভাগ সুন্দরী ও গেওয়া গাছ অতিরিক্ত লবনাক্ততার কারনে ধ্বংস হয়ে গেছে[২৪]।

২১. *Ibid.*
২২. **Crow Ben**, "*Sharing The Ganges*",(UPL, Dhaka, 1995)P-149.
২৩. **Swain Ashok**, "*The Environmental Trap*", Report No-44, 1995,(Uppsala University, Sweden),P.P-68,69.
২৪. *The Survey was Reported in Dhaka Courier*, 9 April, 1993, p- 15.

Dhaka University Institutional Repository

কেবলমাত্র বনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি রিপোর্ট অনুসারে লবনাক্ততা বৃদ্ধির ফলে সুন্দরবনে বসবাস কারী বিশ্ববিখ্যাত প্রানী 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার' বেঁচে থাকা বিপদজনক হয়ে পড়েছে[২৫]। বাংলাদেশের বন বিভাগের ভাষ্য মতে, সুন্দরবনে প্রতি বছর কাঠ ক্ষতির মূল্যমান প্রায় ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান এবং এই অবস্থা চলতে থাকলে সুন্দরবন মরু ভূমিতে পরিনত হবে।[২৬]

বাংলাদেশের এই ম্যানগ্রোভ ফরেষ্টই কাঠ চাহিদার সিংহ ভাগ সরবরাহ করে থাকে। এ সুন্দরবনের ক্ষতি মানে বাংলাদেশের কাঠ সরবরাহের মারাত্মক ক্ষতি নিম্নোক্ত সারণী-৬.৩ এ কাঠ উৎপাদনের নিম্নগতি ১৯৮১ - ৮২ সালে ১,৭৩,৩৬,০০০ কিউবিক ফিট থেকে ১৯৯১ - ৯২ সালে ৬৬,০০০০০ কিউবিক ফিটে নেমে যাওয়ার চিত্র তুলে ধরা হল[২৭]।

সারণী-৬.৩

বাংলাদেশের টিমবার প্রত্তাকশন

ইউনিট- হাজার কিউবিক ফুট

সন	টিমবার
১৯৮১-৮২	১৭,৩৩৬
১৯৮২-৮৩	১৫,৪৫৩
১৯৮৩-৮৪	১৯,৫৬৯
১৯৮৪-৮৫	১৭,৪২৩
১৯৮৬-৮৭	১২,৭৬৪
১৯৮৭-৮৮	১৪,০৭২
১৯৮৮-৮৯	১২,৩৫৭
১৯৮৯-৯০	৬,৭৫১
১৯৯০-৯১	৮,৪১৯
১৯৯১-৯২	৬,৬০০

ভারত সরকার বনজ সম্পদ ক্ষতির অভিযোগ প্রত্যাখান করে অভিমত ব্যক্ত করে যে, গংগার পানি সুন্দরবন পর্যন্ত পৌছায়না। তবে অভিযোগ প্রমান করে যে, গৌরি নদী লবনাক্ততা বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে যা সুন্দরবনকে ক্ষতি করছে। এবং গৌরির পানি প্রবাহ হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে ফারাক্কা বাঁধের প্রভাব থাকতে পারে। সম্ভবত ফারাক্কার পানি প্রত্যাহারে বাংলাদেশের সুন্দরবন হুমকির মুখোমুখি[২৮]।

২৫. **The Daily Star**, Dhaka, 9 January, 1995.
২৬. **Swain Ashok**, "*The Environmental Trap*", Report No-44, 1995,(Uppsala University, Sweden) P-69.
২৭. *Ibid.*
২৮. **Crow Ben**, "*Sharing The Ganges*",(UPL, Dhaka, 1995) P-154.

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পের উপর প্রভাবঃ-

বাংলাদেশের দক্ষিন পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে শিল্প নগরী হিসেবে খ্যাত খুলনা অবস্থিত। ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহারের ফলে লবনাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিল্প কারখানার উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। বাংলাদেশ সরকার তার 'শ্বেত পত্রে' অভিযোগ করেছিল যে, লবনাক্ততা বৃদ্ধি *injured the industrial sector.* শ্বেত পত্রে আরও দাবি করা হয় যে, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পেপার মিল এবং পাট কল সমূহে অতিরিক্ত লবনাক্ত পানি ব্যবহার করতে পারছে না এবং নিরুপায় হয়ে ব্যবহার করায় ধ্বংসের মুখোমুখি। এ অভিযোগের উত্তরে ভারত জানায় যে, এর সাথে কোন কার্য- কারন সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এক বিশেষ জরিপ দল ডিসেম্বর ১৯৭৫ হতে জুন ১৯৭৬ পর্যন্ত শিল্প কারখানার ক্ষতি সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রদান করে নিম্নে তা সারণী-৬.৪ এ তুলে ধরা হল[২৯]।

সারণী-৬.৪

ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহারের ফরে ক্ষয় ক্ষতির পরিমান ডিসেম্বর'৭৫-জুন'৭৬ঃ

শিল্প কারখানা	পানি চাহিদা (মিলিয়ন গ্যালন)	উৎপাদন ক্ষতি	মূল্য (মিলিয়ন টাকা)	উৎপাদন ক্ষতির কারন
গোয়াল পাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	৭ MW	৩৯	কেমিক্যালের জন্য বাড়তি খরচ এবং স্বাদু পানি সংগ্রহ
খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল্স	২৫	২৪০০০ টনস্	০.৭	বয়লারে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যান্ত্রিক ক্ষয়
পাট কল খুলনা (১৬টি)	০.৭	২৯২৮ টনস্	১৮	বিদ্যুৎ বিভ্রাট
অন্যান্য ম্যানুফ্যাকচারিং	১.৩৪	নানাবিধ	৬	অবক্ষয় বৃদ্ধি
চালনা পোর্ট কর্তৃপক্ষ	------------	-------	৫০	লবনাক্ততার জন্য ডিজাইন পরিবর্তন
জিকে পাম্পিং ষ্টেশন	------------	-------	৩.৭	চ্যানেল পরিবর্তন

মোট ব্যয় হিসাব ১১৭.৪

২৯. *Ibid. P.P. 147,148.*

Dhaka University Institutional Repository

লবনাক্ততা বৃদ্ধির কারনে গোয়াল পাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়া হলে শিল্প কারখানা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অপ্রত্যাশিত ও মাত্রাতিরিক্ত লবনের জন্য পানি ব্যবহার উপযোগী করার পদ্ধতিগত বিলম্বের জন্য উৎপাদন কার্যক্রমেও বিলম্ব হয়, মেকানিক্যাল সমস্যা এবং ক্ষতির পরিমান বেড়ে যায়। ১৯৭৬-'৭৭ সালে কিছু কিছু শিল্প কারখানা মিষ্টি পানি অঞ্চল থেকে বার্জের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে চালু রাখে। এ সকল ঘটনা সু-স্পষ্টভাবে প্রমান করে যে, বাংলাদেশ সরকারের উত্থাপিত অভিযোগ নিছক কোন বাগাড়ম্বর নয়[৩০]।

বাংলাদেশের অভিযোগের জবাবে ভারত তার অভিমতে জানায় যে, "কোন তথ্যই স্বয়ং সম্পূর্ন ভাবে উল্লেখিত প্রতিকূল অবস্থার জন্য ফারাক্কা বাঁধ সরাসরি দায়ী বলতে অক্ষম। সচরাচর প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, খুলনা অঞ্চল অতীত কাল থেকে বেশী মাত্রাযুক্ত লবন পানি এলাকা। এ মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার কারন হল এ অঞ্চলের মানুষের গৃহীত কার্যক্রম[৩১]।"

৩০. *Ibid, P- 147.*
৩১. **Begum Khurshida**, *"Tension over the Farakka Barrage"*,(UPL, Dhaka, 1987) P- 145

Dhaka University Institutional Repository

মৎস সম্পদের উপর প্রভাবঃ-

গংগার মিষ্টি পানি বাংলাদেশের মৎস সম্পদের প্রান স্বরূপ। এ মিষ্টি পানির জন্য বিভিন্ন প্রজাতির মৎস সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু গংগার পানি প্রত্যাহারের জন্য শুস্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ কমে যায় এবং পানির তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে অক্সিজেনের ঘাটতি পড়ে ফলে মাছ সহ অন্যান্য জলজ প্রানী প্রতিকূল পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে না। এছাড়াও মৎস কূলের খাবার বিনষ্ট হওয়ায় তাদের স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন ঘটে এবং ধীরে ধীরে মারা যায়। ১৯৭৬ সালে ফারাক্কা বাঁধ চালু হওয়ার পর বাংলাদেশের খুলনা, গোয়ালন্দ ও চাঁদপুর উপকূলে পানির প্রবাহ কমে যায় এবং পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় মৎস উৎপাদন যথাক্রমে খুলনা ৭৫% ভাগ গোয়ালন্দ ৩৪% ভাগ এবং চাঁদপুর ৪৬% ভাগে হ্রাস পায়। হাইড্রো- বায়োলজিকাল অবস্থা পরিবর্তনের ফলে গংগার শাখা নদীগুলোতে ইলিশ মাছ উৎপাদন মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হয়। এছাড়া অন্যান্য মৎস সম্পদ বিশেষ করে বার প্রজাতির চিংড়ি মাছ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফারাক্কা বাঁধ চালুর পর বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ইলিশ সম্পদ ক্রমে ক্রমে অপচিত বা ক্ষীন হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশ মৎস বিভাগের মতে ১৯৭৩-'৭৪ সালে মৎস আহরনের পরিমান ছিল ২৭৬ হাজার মেট্রিক টন সেখানে ১৯৮৯-'৯০ সালে তার পরিমান হ্রাস পেয়ে দাড়ায় ১৭৮ মেট্রিক টনে[৩২]।

গংগা নদীর সাথে সংশ্লিষ্ট নদী থেকে আহরিত মৎস সম্পদের হিসাব পর্যায়ক্রমিক ভাবে বছর ওয়ারী নিম্নে সারণী-৬.৫ এ তুলে ধরা হল[৩৩]।

সারণী-৬.৫

গংগা নদীর সাথে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ এলাকা থেকে বছর ওয়ারী মৎস আহরনের হিসাব।

(হাজার মেট্রিক টন হিসেবে)

বছর	আহরিত মৎস
১৯৭৩-৭৪	২৭৬
১৯৭৪-৭৫	২৭৭
১৯৭৫-৭৬	২০২

৩২. **Swain Ashok**, "*The Environmental Trap*", Report No-44, 1995,(Uppsala University), Sweden P-70.
৩৩. *Ibid P-71*

Dhaka University Institutional Repository

বছর	আহরিত মৎস
১৯৭৬-৭৭	১৯৭
১৯৭৭-৭৮	১৯৩
১৯৭৮-৭৯	১৮৮
১৯৭৯-৮০	১৮৫
১৯৮০-৮১	১৮৩
১৯৮১-৮২	১৯২
১৯৮২-৮৩	১৯৮
১৯৮৩-৮৪	১৯৮
১৯৮৪-৮৫	১৯৪
১৯৮৫-৮৬	১৮৫
১৯৮৬-৮৭	১৮১
১৯৮৭-৮৮	১৭৮
১৯৮৮-৮৯	১৭৬
১৯৮৯-৯০	১৭৮

মাছ বাংলাদেশী জনগনের প্রধানতম খাদ্যের মধ্যে একটি। মানুষের পুষ্টি চাহিদার বিরাট অংশ পূরন করা হয় এ মাছ দ্বারা। কিন্তু মৎস উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় বাংলাদেশের মানুষ অপুষ্টির শিকার হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ যে পরিমান প্রোটিন খায় তার ৮০ ভাগ আসে মাছ থেকে। মাথা পিছু ১৯৭২ সালে যেখানে ১১.৭ কিলোগ্রাম মাছ খেত সেখানে ১৯৮৮ সালে তা নেমে আছে ৭.৫ কিলোগ্রামে। ১৯৮৯-৯০ অর্থবছরে মোট জাতীয় উৎপাদনের ৩.৬ ভাগ এবং মোট রপ্তানি আয়ের ১৩.০৯ ভাগ অর্জিত হয়েছে মৎস সম্পদ থেকে[৩৪]। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের দিক দিয়ে মৎস সম্পদের অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে। এদেশের মোট ১.২ মিলিয়ন জন গোষ্ঠী প্রত্যক্ষ এবং ১০ মিলিয়ন পরোক্ষ ভাবে মৎস আহরন করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। মৎস সম্পদ উৎপাদনে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের মৎস পেশাজীবি জনগনের এক বিরাট অংশ ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে। গংগা তীরে বসবাস কারী জেলেদের বর্ননা মতে ***"ফারাক্কা বাঁধ আমাদের মুখের গ্রাস, আশা ভরসা এবং স্বপ্ন সবকিছু কেড়ে নিয়েছে।"***

৩৪. *Ibid-P-71.*

Dhaka University Institutional Repository

এক সময় গংগার ঢেউয়ের সাথে বাঘের গর্জনের সংগে তুলনা করা যেত যা বর্তমানে মৃত অজগরের মত প্রান হীন[৩৫]।

গবেষক ***Ashok Swain*** ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের গংগা নদীর নির্ভর এলাকা কুষ্টিয়া অঞ্চলে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন গ্রামে জেলেদের খোঁজ খবর নিয়ে দেখেন যে, অনেক জেলে পরিবার অজানা স্থানে পাড়ি জমিয়েছে যাদের কোন ঠিকানা নেই। গৌরি নদীর তীরে অবস্থিত হরিপুর নামক গ্রাম এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। ঐ গ্রামের আজিজ মন্ডল নামক এক ব্যক্তির বর্ননা মতে, ''প্রায় ২,৫০০ জেলে এবং তাদের পরিবার এ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে ১৯৭৫ সালে ফারাক্কা বাঁধ চালুর পর নদী শুকিয়ে যাবার কারনে'[৩৬]।

৩৫. *Ibid-P.72.*

৩৬. *Ibid-P.72.*

Dhaka University Institutional Repository

নৌ-চলাচলের উপর প্রভাব

নদী বাংলাদেশকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে। যার জন্য অভ্যন্তরীন যোগাযোগের প্রধান উপায় হচ্ছে নৌ-চলাচল ব্যবস্থা। গংগা নদীর প্রবাহের উপর নির্ভরশীল নৌ-পথগুলি শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় পানি প্রবাহের অভাবে মারাত্মক সংকটের মুখোমুখি হয়। উজানে পানি প্রত্যাহারের ফলে ক্ষতি গ্রস্থ নদী গুলোর স্থান হলোঃ-

১। উজানে গংগা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মিলিত প্রবাহ বা নদী সঙ্গম।

২। গংগার জল নিষ্কাষনের খাল গৌরি থেকে কামার খালী ঘাট পর্যন্ত।

৩। কামার খালী থেকে মধুঁমতি নদীর ভাটি অঞ্চল পর্যন্ত। গংগা ও তার শাখা নদী যেখান থেকে ফারাক্কা বাঁধ চালুর পূর্বে বড় বড় স্টীমার চলত সেখানে বর্তমানে শুষ্ক মৌসুমে ছোট ছোট নৌকা ছাড়া আর কিছুই চলতে পারেনা[৩৭]। বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রীর বর্ননা মতে, *"ইহা দু:খ জনক হলেও সত্য যে, সীমান্তে স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বাঁধা দানের ফলে বাংলাদেশের নৌ-পথ হুমকির মুখোমুখি"*[৩৮]।

বাংলাদেশ সরকার দেশের অভ্যন্তরীন নৌ-চলাচল ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহারের ফলে যে সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন সে সম্পর্কে অভিযোগ করেন যে, "দুটি প্রধান ফেরী টার্মিনাল স্থানান্তরিত করে চালু রাখা হয়েছে একটি চার মাইল অন্যটি পাঁচ মাইল দূরে.....।" গোদাগারী থেকে আরিচা পর্যন্ত নব্বই মাইল নৌ-পথ নৌ-চলাচলে অনুপযোগী এর মধ্যে পঁয়তাল্লিশ মাইল গৌরী এবং পনের মাইল পদ্মা এছাড়াও এ অঞ্চলের সর্বত্র নৌ চলাচল বিঘ্নিত[৩৯]। বাংলাদেশের অভিযোগের জবাবে ভারতের অভিমত হলো, "পদ্মা বাংলাদেশের নৌ-চলাচলের উল্লেখযোগ্য পথ নয়। বিশেষ গবেষক দলের মতে, ক্ষতি গ্রস্থ নৌ-পথ বাংলাদেশের গুরুত্ব পূর্ণ নৌ-পথ নয়, তবে ফারাক্কার ক্ষতিকর প্রভাব অভ্যন্তরীন নৌচলাচল বিঘ্নিত করেছে[৪০]।"

অত:পর ভারত পদ্মার নাব্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য পরামর্শ প্রদান করেযে, *"নদীর মোহনায় বালির চড়াগুলো সামান্য ড্রেজিং করলে পদ্মা তার নাব্যতা ফিরে পাবে"*[৪১]।

৩৭. *Ibid*,P-72.
৩৮. *The Daily Star* Dhaka, 21 December, 1994.
৩৯. **Begum Khurshida**, *"Tension Over The Farakka Barrage"*,(UPL, Dhaka, 1987), P-145.
৪০. **Crow Ben**, *"Sharing The Ganges,"*(UPL,Dhaka, 1995),P-155.
৪১. **Begum Khurshida**, *"Tension Over The Farakka Barrage"*,(UPL, Dhaka, 1987), P- 146.

Dhaka University Institutional Repository

মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে বরিশাল জেলায় রেল যোগাযোগ নেই। এখানে যোগাযোগ রক্ষার প্রধান উপায় নৌ-পথ। বাংলাদেশের চার ভাগের তিন ভাগ অভ্যন্তরীন যোগাযোগ নৌ-পথ নির্ভর। এখানে পাঁচটি গুরুত্ব পূর্ণ নৌ-বন্দর রয়েছে। যথাঃ- ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, চাঁদপুর, বরিশাল ও খুলনা এবং ১,৪১৪ টি নৌ- স্টেশন আছে। যা দ্বারা ২.৫ কোটি যাত্রী বহন এবং ২৫ লক্ষ টন মালামাল বহন করা হয়। এছাড়াও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নৌকা চালনা পেশার সাথে যুক্ত রয়েছে লক্ষ লক্ষ জনগোষ্ঠী"[৪২]।

ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহারের শুরুতে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা সমস্যা সম্পর্কিত চিত্র তুলে ধরার জন্য নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। ৭ মার্চ ১৯৭৬ বাংলাদেশ টাইমস্ এ বলা হয় যে, জনগন উদ্বিগ্ন এজন্য যে, ক্রমাগত পানি কমতে থাকলে আরিচা ফেরি সার্ভিস এবং গৌরি ও কামার খালী ফেরী বন্ধ হয়ে যাবে। ১০ মার্চ ১৯৭৬ দৈনিক সংবাদ লিখে যে, ক্রমাগত নৌ-পথ মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন, স্টীমার সার্ভিস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তদস্থলে সী-ট্রাক চালু করা হয়েছে। ১১মার্চ ১৯৭৬ বাংলাদেশ অবজারভারে বলা হয় যে, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন সবচেয়ে ব্যস্ত নারায়নগঞ্জ, চাঁদপুর, গোয়ালন্দ রুটে স্টীমার চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে[৪৩]। উল্লেখিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার প্রতিবেদন থেকে লক্ষ্যনীয় যে, ঐসময় ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে পানি প্রত্যাহারের ফলেই সংকট জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যা দেশের নৌ-চলাচল ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে ফেলেছে।

৪২. *Ibid*
৪৩. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

হাইড্রোলজিক্যাল পরিবর্তন

গংগার পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের হাইড্রোলজিক্যাল পরিবর্তন ঘটে। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে ওয়াটার লেভেলে যেখানে গড় প্রবাহ ছিল ৬৪,৪৩০ কিউসেক সেখানে তা নেমে আসে ২,৩০০ কিউসেকে। ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল ২২ ফুট থেকে ১৭ ফুটে নেমে আসে। অর্থাৎ পানির স্তর পূর্বের তুলনায় ৫ ফুট নিচে নেমে যায়[৪৪]। গংগার প্রধান জল নিস্কাষন খাল গৌরিতে পলি জমে তার ধারন ক্ষমতা লোপ পায়। উজানে পানি প্রত্যাহারের ফলে হাইড্রোলজিক্যাল প্রভাব নিম্নরূপঃ[৪৫]

১। অতিরিক্ত পলি জমে নদীর গতি পথ ভরাট হয়ে যায় এবং নদীর পানি ধারন ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে বন্যার সৃষ্টি হয়।

২। ভূমির আদ্রতা কমে যায় এবং লবনাক্ততা বেড়ে গিয়ে মরুময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

৩। মিষ্টি পানির প্রবাহ বন্ধ করে দেয়ায় উপকূলীয় এলাকায় লবনাক্ত পানি প্রবেশ করে ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট নষ্ট করে ফেলেছে।

৪। পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ায় কৃষি, শিল্প, নৌ-চলাচল, মৎস সম্পদ ও খাবার পানি সংগ্রহে সংকট দেখা দেয়।

৫। সব মিলিয়ে গোটা দেশের আবহাওয়ার স্বাভাবিকতা নষ্ট করে ফেলেছে।

ব্যাপক বন্যা

শুস্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় বাংলাদেশের নদীগুলোতে পলি জমে নদীর গতি পথ ভরাট হয়ে যায় এবং পানি বহন ক্ষমতা হ্রাস পায়। হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ ডিস্ চার্জ (আগষ্ট- সেপ্টেম্বর) তথ্যে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ এর পূর্বে ছিল ৪৯,৭৯৮ এবং পরে ৫৫,৬২১ কিউবিক মিটার। অন্যদিকে বার্ষিক নুন্যতম ডিস্ চার্জ (মার্চ-এপ্রিল) ছিল যথাক্রমে ২০০৬ এবং ৭৭২ কিউবিক মিটার। নিম্নোক্ত সারণী-৬৬ এর চিত্রে দেখা যায় যে, বর্ষা মৌসুমে সর্বোচ্চ গড় প্রবাহ বেড়েছে ১২.৪৭ ভাগ এবং শুস্ক মৌসুমে গড় হ্রাস প্রবাহ ৬১.৫১ ভাগ। ফলে বর্ষাকালে বার বার বাংলাদেশ সর্বনাশা বন্যার শিকার হচ্ছে[৪৬]।

44. *Ibid, P-131.*
45. Islam Nahid, "*The Ganges Water Dispute: Environmental and Related impacts on Bangladesh*", **BIISS Journal,** Vol-12, No-3, July-1993, P-276.
46. **Swain Ashok,** "*The Environmental Trap*", Report No-44, 1995,(Uppsala University, Sweden) P.P-73,74.

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৬' ৬

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে

গংগার সর্বোচ্চ ও সর্ব নিম্ন ডিস চার্জ চিত্র

(ডিস্চার্জ ইন কিউবিক মিটার)

বছর	সর্বোচ্চ	গড়	সর্বনিম্ন	গড়
১৯৫৬	৫৭,৪৩৯		২,১৬৬	
১৯৫৭	৪৩,৬৫৮		২,২৪৫	
১৯৫৮	৫৩,৯৩৯		২,২৮৬	
১৯৬৩	৫৮,২২২		২,০২৩	
১৯৬৪	৪২,২৩৩		১,৯৫৪	
১৯৬৮	৪৪,৩৪৬		১,৭০৫	
১৯৬৯	৫৪,৭৪৭		১,৭১৯	
১৯৭০	৪৮,৭০০		২,০৩০	
১৯৭৩	৩৮,২০০		২,২৪০	
১৯৭৪	৫০,৭০০		১,৯৩০	
১৯৭৫	৫০,৭০০		১,৭৭০	
১৯৭৬	৫১,১০০		৬৫৭	২,০০৬
১৯৭৭	৬৫,৪০০		৬৯৬	
১৯৭৮	৫১,১০০	৪৯,৪৯৮	৮৮৯	
১৯৭৯	৬৭,৯০০		১,২১০	
১৯৮০	৩৬,৯০০		৮৭৪	
১৯৮১	৫৭,৮০০		৮৭৭	
১৯৮২	৪৭,৯০০		৮৭৭	
১৯৮৩	৬১,৬০০		৬৯৫	
১৯৮৪	৬০,০০০		৭০০	
১৯৮৫	৫৬,৫০০		৭৪০	
১৯৮৬	৫০,৬০০		৬৮৩	
১৯৮৭	৬৮,০০০		৮২৫	
১৯৮৮	৭২,০০০		৮৯০	
১৯৮৯	৩৩,০০০		৪৩৮	
১৯৯০	৫০,০০০	৫৫,৬২১	৫৫৯	৭৭২

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত গুরুত্ব পূর্ন ডিসচার্জ পরিবর্তন সাধিত হওয়ার কারন হলো ফারাক্কায় গংগার পানি সরাসরি নিয়ন্ত্রন। ভারত শুস্ক মৌসুমে সিংহভাগ পানি প্রত্যাহার করে এবং বর্ষা কালের অপ্রয়োজনীয় পানি বাংলাদেশে ছেড়ে দিয়ে প্লাবনের সৃষ্টি করে। শুস্ক মৌসুমে ভারত ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশে মাত্র ১০,০০০ কিউসেক পানি ছাড়ে কিন্তু বর্ষা মৌসুমে ধারন ক্ষমতার অতিরিক্ত ২.৭ মিলিয়ন কিউসেক পানি ছেড়ে দেয়। হঠাৎ পানির উওাল তরঙ্গে নদী নালা স্ফীত হয়ে উঠে। পলি জমে ভরে যাওয়া নদীগুলো অতিরিক্ত পানি ধারন করতে পারে না ফলে তীরাঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হয়। ফারাক্কা বাঁধের পরে ও ভারত হুগলী- ভাগীরথী নদীর উপর জঙ্গীপুরে আরো একটি বাঁধ নির্মান করেছে ফিডার ক্যানেল মোহনার উপরে[৪৭]। ফলে বন্যার তীব্রতা আরো বেড়ে গিয়ে বাংলাদেশের জন্য জীবন মরন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। নিম্নে ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত বন্যার ক্ষয় ক্ষতির পরিমান সারণী-৬.৭ এ তুলে ধরা হলো[৪৮]।

সারণী-৬.৭

বাংলাদেশের বন্যার ক্ষয় ক্ষতির চিত্র

বছর	প্লাবিত এলাকা	ক্ষয় ক্ষতির পরিমান মিলিয়ন টাকায়
১৯৫৬	২৪.৭	২,১৮০
১৯৬০	১৯.৭	-----
১৯৬১	২০.০	-----
১৯৬২	২৬.০	১,০২০
১৯৬৩	৩০.০	৮৩
১৯৬৪	২১.৭	২৪৬
১৯৬৫	২০.০	৪৫
১৯৬৬	২৪.৩	৫৪৪
১৯৬৭	১৮.৯	৯০
১৯৬৮	২৬.০	১,৬৫৪
১৯৬৯	২০.৯	৩৩০
১৯৭০	২৯.৬	১,৩৮০
১৯৭১	২৫.৩	-----
১৯৭২	১৪.৪	-----

৪৭. *Ibid*, P-75.
৪৮. **Khan Abdur Rob and Nazem Nurul Islam**, "*Abundance and Scarcity of Water in Bangladesh: Issues Revisited*". **BIISS Journal**, Vol-9, No-4, P-478.

Dhaka University Institutional Repository

বছর	প্লাবিত এলাকা	ক্ষয়ক্ষতির পরিমান মিলিয়ন টাকায়
১৯৭৩	২০.৮	-----
১৯৭৪	৩৬.৬	১,০০০
১৯৭৫	১১.৫	-----
১৯৭৬	১৯.৭	-----
১৯৭৭	৮.৭	-----
১৯৭৮	৭.৫	-----
১৯৮০	২২.৯	-----
১৯৮২	২.২	-----
১৯৮৩	৭.৭	-----
১৯৮৪	১৯.৭	২,৫০০
১৯৮৫	৭.৯	-----
১৯৮৬	৩.২	-----
১৯৮৭	৩৯.৯	১৫.০০০
১৯৮৮	৬৭.০	২৫,০০০

১৯৮৮ সালের আগষ্ট- সেপ্টেম্বরে প্রলয়ংকারী বন্যায় দেশের চার ভাগের তিন ভাগ প্লাবিত হয়। তখন বাংলাদেশে খোলাখুলি ভাবে ভারতের সমালোচনা করেছে এবং এ চরম অবস্থা ***"মানুষের সৃষ্টি"*** বলে উল্লেখ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর ফারাক্কার প্রভাব

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বাংলাদেশ অংশের হিসাব মতে ফারাক্কা নির্মানের মাধ্যমে পানি প্রত্যাহারের ফলে ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমান ১,১৩,২৪০ মিলিয়ন টাকা বা ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিম্নে সারণী-৬৮ -এ বন্যার ক্ষতির পরিমান বাদে অন্যান্য ক্ষতির পরিমান তুলে ধরা হল[৪৯]।

সারণী-৬৮

১৯৭৬-'৯৩ সাল পর্যন্ত ফারাক্কার প্রভাবে সমন্বিত অর্থনৈতিক ক্ষতি।

বিষয় বা আইটেম	আর্থিক ক্ষতি(মিলিয়ন টাকায়) (১৯৯১ বাজার দরে)
কৃষি	৩৭,০০০
মৎস	৬৩,০০০
বনবিভাগ	৯,৯০০
শিল্প	১,১৫০
পাবলিক হেল্থ	১,১৮০
নেভিগেশন	৫৬০
ড্রেজিং	৪৫০
মোট	১,১৩,২৪০

অমীমাংসিত গংগার পানি বিতর্ক দু'দেশের মধ্যকার দ্বন্দ বৃদ্ধি করেছে এবং পরস্পর পানি সম্পদ আয়ত্বে রাখার প্রচেষ্টায় সংগ্রাম মুখর। উপরোক্ত সারণীতে প্রদত্ত ক্ষয় ক্ষতির পরিসংখ্যান থেকে ভারত কর্তৃক পানি প্রত্যাহারের প্রভাব সম্পর্কে সু-স্পষ্ট ধারনা লাভ করা যায়। যদিও ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতি একটা দেশের জন্য উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু এর প্রতিকূল প্রভাব প্রতিনিয়ত সরাসরি এ দেশের বিশাল জনসংখ্যার জীবন ও জীবিকার উপর আঘাত হানছে[৫০]।

৪৯. Swain Ashok. *"The Environmental Trap"*, Report No-44, 1995,(Uppsala University, Sweden) P-77.
৫০. *Ibid.*

Dhaka University Institutional Repository

ফারাক্কার প্রভাবে ব্যাপকভাবে বাংলাদেশের দক্ষিন-পশ্চিম অঞ্চলের সার্বিক পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। কৃষি, শিল্প, নৌ-চলাচল, মৎস সম্পদ সংকটাপন্ন, দেশের মূল্যবান বন সম্পদ বিলুপ্তির পথে, ব্যাপক নদী ভাঙ্গন ও বন্যা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এ দেশের কৃষি সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা ও প্রান্তিক চাষিরা। এদের জীবন নির্বাহ করা সাধ্যের বাইরে চলে গিয়েছে। একই ভাবে আক্রান্ত হচ্ছে দেশের মৎস জীবিরা। খুলনা বিভাগের অন্তর্গত কুষ্টিয়া জেলার অধিকাংশ জেলেরা তাঁদের পেশা ছেড়ে দিয়েছে। এবং জীবন ও জীবিকার সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে[৫১]।

জীবন ও জীবিকা সংগ্রামে হেরে গিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের পেশা জীবিরা কি জন্য তাদের পূর্ব পুরুষদের পেশা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, তার কারন সর্বস্তরের কৃষক শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের কাছে আয়নার মত পরিস্কার। আর তা হলো ভারত কর্তৃক নির্মিত ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে পানি প্রত্যাহার। সংগত কারনেই বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগন এ অমানবিক আচরনের জন্য ক্রমাগত ভাবে ভারত বিদ্বেষী হয়ে উঠে। এবং প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসাবে জনগন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশকে আন্দোলিত করেছে অসংখ্য বার।

৫১. *Ibid*-P-78.

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৭

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জী

শব্দ সূচী।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ভারত সরকার কোলকতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষার নামে ফারাক্কা বাঁধ নির্মান করে বাংলাদেশ তথা বাঙ্গালী জাতিকে বিপদাপন্ন করার মত অমানবিক কাণ্ড করে তাদের গৃহীত কার্যক্রম চালু রাখে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষরিত ২৫ বছর বন্ধুত্ব ও শান্তি চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে, "উভয় দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদী সমূহের ব্যাপক জরিপ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে উভয় দেশের জন্য প্রকল্প প্রনয়ন ও সেগুলোর বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই দু'দেশের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে স্থায়ী ভিত্তিতে একটি যৌথ নদী কমিশন গঠন করা হবে"। শান্তি চুক্তি মোতাবেক ফারাক্কা সমস্যা সমাধানের জন্য যৌথ নদী কমিশন যথা সময়ে গঠিত হলেও বাংলাদেশের সমস্যা সন্তোষজনক সমাধান কখনো হয়নি। ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে পরীক্ষামূলক ভাবে ফিডার ক্যানেল চালু করার কথা বলে ৪১ দিনের জন্য ফারাক্কা বাঁধ চালু করা হয়। কিন্তু ৪১ দিন সময়সীমা পার হওয়ার পরও ভারত বাংলাদেশের সাথে কোন চুক্তি বা সমঝোতা ছাড়াই ১৯৭৬ সালের শুস্ক মৌসুমে ফিডার ক্যানেলের ক্ষমতা অনুযায়ী একতরফা ভাবে পানি প্রত্যাহার করতে শুরু করে।

এর ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। নদীর তলদেশ ভরাট হতে থাকে। বর্ষা মৌসুমে সৃষ্টি হয় বন্যা, বঙ্গোপসাগর থেকে অনুপ্রবেশকারী লবনাক্ত পানি দেশের দক্ষিন পশ্চিম অঞ্চলের আরো ভিতরে ঢুকে পড়ে। দূষিত হয় ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-অভ্যন্তরের পানি। হুমকির মুখে গিয়ে পড়ে কৃষি, পানি, শিল্পায়ন এবং জন স্বাস্থ্য। বিপর্যয়ে পড়ে সুন্দরবন, মৎস এবং বন্য প্রানীর অস্তিত্ব হয়ে পড়ে বিপদাপন্ন। হাজার হাজার ধীবর পরিবার উৎখাত হয় নিজস্ব পেশা থেকে। আরও অনেকেই হারায় তাদের জীবিকা। জমি হারায় তার উর্বরা শক্তি বা গুন। পদ্মা নদীর অববাহিকায় চার কোটি মানুষ হয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সারা এলাকায় শুরু হয় মরুয়ায়ন প্রক্রিয়া। বিনষ্ট হয় তাপ মাত্রার সমন্বয়। যে অঞ্চলে গ্রীষ্ম কালে তাপ মাত্রা ৪০ থেকে ৪২ ডিগ্রী সেলসিয়াস উঠে যায়, শীত কালে তা নেমে আসে

Dhaka University Institutional Repository

৪ থেকে ৫ ডিগ্রীতে। আবহাওয়া বিদরা উদ্বেগ প্রকাশ করেন যে, এভাবে চলতে থাকলে ২০১০ সাল নাগাদ দেশের সমগ্র উত্তরাঞ্চল এক সময় মরুভূমিতে পরিনত হবে।

ফারাক্কা বাঁধ কেবলমাত্র বাংলাদেশের অর্থনীতি ও পরিবেশকেই প্রভাবিত করেনি ইহা এ দেশের রাজনীতিকে করে তুলেছে অস্থিতিশীল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রান পুরুষ মাওলানা ভাসানীর ঐতিহাসিক লংমার্চ থেকে শুরু করে ফারাক্কা সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে অসংখ্য বার বিভিন্ন মুখি রাজনৈতিক কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। ১৯৭৭ সালে রাজনৈতিক দল ও জনগনের চাপের মুখে ক্ষমতাসীন সরকার বিষয়টি জাতিসংঘের সাধারন পরিষদের ৩১ তম অধিবেশনে উত্থাপন করে। ফলে বিশ্ববাসীর চাপে ১৯৭৭ সালে ভারত পাঁচ বছর মেয়াদী পানি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির মেয়াদ শেষ হয় ১৯৮২ সালের ৩১ মে। পরে দু'বছর এবং ৩ বছর করে চুক্তির দু'দফা মেয়াদ বাড়ানো হয়, যার মেয়াদ শেষ হয় ১৯৮৮ সালে। ১৯৮৮ সালের ৩১ মে চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেও ভারত নতুন কোন চুক্তি স্বাক্ষরে অস্বীকৃতি জানায়। তার পর ৮ বছর কেটে যায় চুক্তি শূন্য অবস্থায়। সাবেক প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিষয়টির রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের ৪৮ তম অধিবেশন এবং ১৯৯৫ সালের জাতিসংঘের ৫০ তম অধিবেশনে ফারাক্কা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু সমস্যার সমাধানে কোন প্রকার অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

সুদীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় এলে ৮ বছরে বিশ দফা বৈঠকে যা সম্ভব হয়নি ক্ষমতা গ্রহনের ৬ মাসের মধ্যে ৫ টি বৈঠকে তা সম্ভব করে তোলা হয়েছে। দীর্ঘকাল যাবত চুক্তি না থাকায় চুক্তি সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছিল হতাশা এবং দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিভেদই প্রায় স্থায়ী রূপ পেয়ে গিয়েছিল। বিগত ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ ঐতিহাসিক ৩০ বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষরে সমস্ত রকমের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অবসান ঘটেছে।

১৯৯৬ সালের দীর্ঘ মেয়াদী পানি চুক্তি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। কেননা স্বাধীনতার পর দীর্ঘ আলোচনায়

Dhaka University Institutional Repository

এর কোন দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। চুক্তিটি দু'দেশের পারস্পরিক সুবিধা তথা এ অঞ্চলের একই স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সমম্বয় সাধনের পথ সুগম করে দিয়েছে। ৩০ বছর মেয়াদী এবং মেয়াদ শেষে নবায়নের সুযোগ থাকায় বড় রকমের অনিশ্চয়তা দূর হয়েছে।

এ চুক্তি ভারত- বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কেননা ইহা রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি পূরন ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতীক স্বরূপ। যার মাধ্যমে দু'দেশের সম্পর্কের একগুয়েমী ভাবের অবসান ঘটেছে। ভারত এবং প্রতিবেশী ছোট ছোট দেশের মধ্যে সামঞ্জস্যের বিস্তার ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এ চুক্তি দক্ষিন এশিয়ার দেশ গুলোর জন্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির চিহ্ন বহন করে।

১৯৯৬ সালের এ পানি বন্টন চুক্তি দু'দেশের মধ্যকার দীর্ঘ দিনের বিভিন্ন সমস্যা মিটিয়ে ফেলার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ফলে দু'দেশ অমীমাংসিত বিষয় গুলো গুছিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

যেহেতু এ চুক্তির মধ্যদিয়ে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে, সেহেতু দু'দেশের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত অন্যান্য যৌথ নদীর পানি বন্টনের যে সকল সমস্যা রয়েছে তা সমাধানে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহন করা সম্ভব হবে। চুক্তিটি সম্পাদনের পূর্বে ভারত গংগার সবটুকো জল আত্মসাৎ করে চলছিল এবং পূর্ববর্তী সরকার গুলো জাতিসংঘ সহ নানা সংস্থার মাধ্যমে এর সমাধানের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। দীর্ঘ মেয়াদী এই চুক্তি সম্পাদনের ফলে অন্তত: ভারত একতরফা ভাবে গংগার সবটুকো পানি প্রত্যাহার করতে পারবে না।

সর্বপরি বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান ধারা গংগার পানি বন্টনকে কেন্দ্র করে অনেক সময় আবর্তিত হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন সরকারের উপর ফারাক্কা সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন সময় চাপ সৃষ্টি করেছে। ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন রাজনীতি বার বার উত্তপ্ত হয়েছে। চুক্তির মাধ্যমে এসব রাজনৈতিক সমস্যার অবসান ঘটেছে। তাছাড়া এ চুক্তি কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই নয় আর্থ- সামাজিক প্রেক্ষিতেও ইতিবাচক ভুমিকা রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

ফারাক্কা বিতর্ক বাংলাদেশী জনগনকে যে ভারত বিরোধী হতে সাহায্য করেছে তা ইতোমধ্যেই প্রমানিত হয়েছে কেননা পানির অভাবে এ দেশের কৃষি, শিল্প, মৎস, নৌ- চলাচল, পরিবেশ ও অর্থনীতির উপর প্রচন্ড ধাক্কায় এদেশের বহু পেশাজীবি শ্রেনী মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশীদের চোখে ভারত সৎ- বন্ধু সুলভ প্রতিবেশীর অবস্থান থেকে সরে পড়েছে এবং সময়ের পরীক্ষায় তাঁরা উত্তীর্ন হতে পারেনি। ১৯৯৬ সালে দীর্ঘ মেয়াদী পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় সর্বস্তরের জনগনের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। তারা ভাবছে শুকনো পদ্মায় আবার পানি প্রবাহিত হবে এবং বাংলাদেশ ফিরে পাবে তার হারানো ঐতিহ্য। চুক্তির ধারা সমূহ সঠিক ভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ তার প্রত্যাশিত পানির চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। এবং ধীরে ধীরে বাংলাদেশীদের ভারত বিদ্বেষী মানসিকতার অবসান ঘটবে।

....

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থাবলীঃ

1. B. M. Abbas A T. The Ganges water dispute, Dhaka: University press Limited, 1982.

2. Ashok Swain, The Environmental Trap: The Ganges River Diversion, Bangladesh Migration and Conflicts in India, Department of Peace and Conflict Research, Sweden: Uppsala University, 1985.

3. Ahmad, Q. K, Ahmad Nilufar and Sajjadur Rasheed, Resources, Environment and Development in Bangladesh: with particular Reference to the Ganges, Brahmaputra and Meghna Basins, Dhaka: Bangladesh Unnayan Parishad 1995.

4. Ben Crow, Sharing the Ganges the politics and technology of river development, Dhaka: University press Limited, 1997.

5. Begum Khurshida, Tension over the Farakka Barrage a techno- political tangle in south Asia , Dhaka: University press Limited, 1987.

6. Chowdhury Jahiruddin, Flood control in a Flood plain country Experiences of Bangladesh, Institute of Flood control and Drainage Research, Bangladesh University of Engineering and technology, Dhaka: Bangladesh, october, 1996.

7. Islam M Rafiqul, The Ganges water dispute : its International Legal Aspects, Dhaka: University press Limired, 1987.

৮. বি. এম. আব্বাস এটি, ফারক্কা ব্যারাজ ও বাংলাদেশ, ঢাকাঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ ১৯৮৮।

****

Dhaka University Institutional Repository

গবেষনা পত্রিকা/সাময়িকী

০১। BIISS Journal, Dhaka, Vol- 5, No- 3, July- 1984.

০২। BIISS Journal, Dhaka, Vol- 7, No- 1, January- 1986.

০৩। BIISS Journal, Dhaka, Vol- 7, No- 3, July- 1986.

০৪। BIISS Journal, Dhaka, Vol- 9, No- 4, October- 1988.

০৫। BIISS Journal, Dhaka, Vol-12, No- 3, July- 1991.

০৬। BIISS Journal, Dhaka, Vol-15, No- 3, July- 1994.

০৭। BIISS Journal, Dhaka, Vol-19, No- 2, April- 1998.

০৮। ঢাকা কুরিয়ার, ঢাকা।

০৯। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা।

১০। সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ঢাকা।

১১। সাপ্তাহিক রোববার, ঢাকা।

১২। সাপ্তাহিক যায় যায় দিন, ঢাকা।

****

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদ পত্রঃ

১. দি ডেইলী ষ্টার, ঢাকা।

২. বাংলাদেশ অবজারভার, ঢাকা।

৩. দি নিউ ন্যাশন, ঢাকা।

৪. দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা।

৫. দৈনিক আজকের কাগজ, ঢাকা।

৬. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা।

৭. দৈনিক ভোরের কাগজ, ঢাকা।

৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা।

৯. দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা।

১০. দৈনিক মানব জমিন, ঢাকা।

১১. দৈনিক দিনকাল, ঢাকা।

****

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সূচীঃ

কিউসেক	=	প্রতি সেকেন্ডে এক ঘন ফুট জল স্রোতের প্রবহনের পরিমাপ।
কিউবিক মিটার	=	প্রতি সেকেন্ডে এক ঘন মিটার।
M A F	=	Million acre Feet.
Micro-mhos	=	Electrical conductivity of liquid expressed in mhos. One millionth of one mhos.
M W (mega watt)	=	One millionth watt. Watt is unit of power.

****